আনন্দমেলা

১৫ আগস্ট ১৯৮২
২·৫০
আনন্দবাজার প্রকাশন

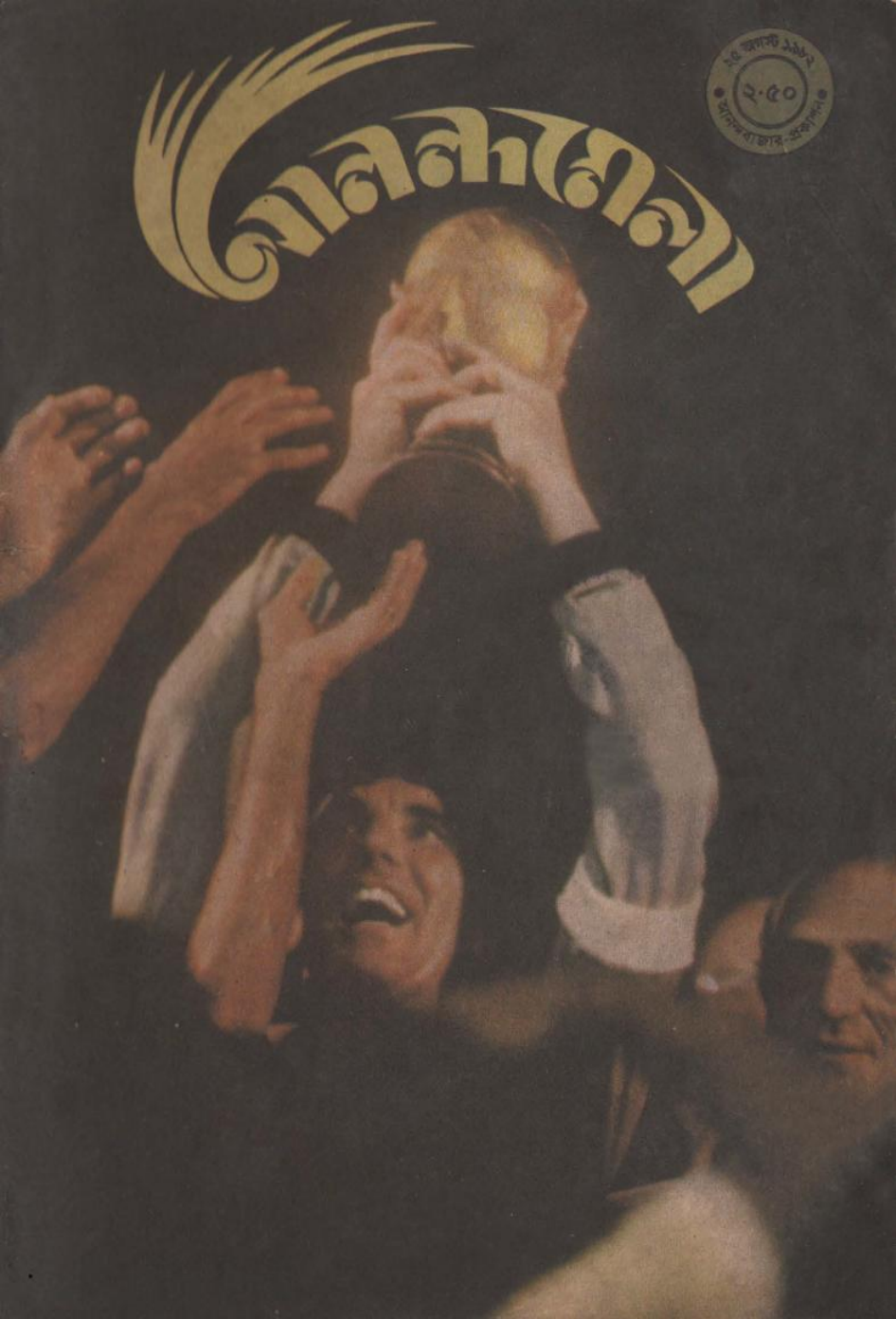

পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি - শ্রীকৃষ্ণ লাইব্রেরী (সোমনাথ দাসগুপ্ত)

স্ক্যান ও এডিট - অপ্তিমাস প্রাইম

যোগাযোগ

dhulokhela@gmail.com

optifmcybertron@gmail.com

তোমাদের মনের মতো রঙিন পূজাবার্ষিকী

রবীন্দ্রনাথের
রামরাজত্ব
(অপ্রকাশিত ইংরেজী নাটিকার ক্ষিতীশ রায়-কৃত ভাবানুবাদ)

উপন্যাস
সত্যজিৎ রায়
(ফেলুদা-কাহিনী)

সমরেশ বসু
বিমল কর
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়
শৈলেন ঘোষ

বড়গল্প
আশাপূর্ণা দেবী
বুদ্ধদেব গুহ
সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

গল্প
সুকুমার সেন, লীলা মজুমদার, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, সমরেশ মজুমদার, সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, তারাপদ রায়, অজেয় রায়, হিমানীশ গোস্বামী, অরুণ বাগচী, বলরাম বসাক, আনন্দ বাগচী, শেখর বসু ও আরও অনেকে।

সুবিশাল চিত্রকাহিনী
"ছেলেধরা"

ছড়া ও কবিতা
অবনীন্দ্রনাথ, অন্নদাশঙ্কর রায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সুনির্মল বসু, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সন্তোষকুমার ঘোষ, মৌমাছি, গোবিন্দ চক্রবর্তী ও আরও অনেকে।

পরীক্ষার্থীদের জন্য
হেড এগজামিনারের : কী করে নম্বর বাড়াতে হয়।

ক্রিকেট ও ফুটবল নিয়ে লিখছেন : রাজু মুখোপাধ্যায় ও ভাস্কর গাঙ্গুলি।

ধাঁধা, মজা, ম্যাজিক, শব্দসন্ধান।
আরও অজস্র আকর্ষণ।

দাম : ১৮ টাকা

তোমাদের কপির জন্য এখনই এজেন্টকে বলে রাখো বা আমাদের লেখো :—
সার্কুলেশন কন্ট্রোলার
আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড
কলিকাতা-৭০০ ০০১

ফটো টাইপ সেটিং পদ্ধতিতে অফসেটে ছাপা, ঝকঝকে লেখায় ঠাসা পূজাবার্ষিকী

ABP/AM/CAS-1/82 BEN

ঝড়বাদলে ভিজলে পরে
ভুগতে হবে সর্দিজ্বরে,
কয়েকটা দিন এখন তাই
সাবধানে খুব থাকাই চাই।
যতক্ষণ না নীল আকাশে
সাদা মেঘের নৌকা ভাসে,
ডুব দে সবাই গদ্যে-পদ্যে
এই আনন্দমেলার মধ্যে।

আনন্দমেলা

৮ ভাদ্র ১৩৮৯
২৫ আগস্ট ১৯৮২ ● ৮ বর্ষ ● ১৫ সংখ্যা

খেলাধুলো : বিশ্বকাপ সিরিজ
ব্রাজিল কেন হারল। শ্যামসুন্দর ঘোষ
দুই মহাদেশের দুই ফুটবল। কৃষ্ণচন্দ্র গুপ্ত
দেখতাম গোলরক্ষকদের। ভাস্কর গাঙ্গুলি

গল্প
রুমাল। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

ছড়া
ভৌতিক। শঙ্খ ঘোষ ৫

উপন্যাস
জঙ্গলগড়ের চাবি। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ১১
রুআহা। বুদ্ধদেব গুহ ২১

স্মৃতিকথা
বসু-বাড়ি। শিশিরকুমার বসু ২৭

চিত্রকাহিনী ও কমিক্স
ফ্ল্যাশ গর্ডন ১৫, রোভার্সের রয় ১৬, সদাশিব ১৮, টারজান ৩১ টিনটিন ৩৪, গাবলু ৫০

খেলোয়াড়ের আত্মকথা
উইং থেকে গোল। পি. কে. ৪৩

লেখাপড়া
মাধ্যমিকে কৃতী ছাত্রী রুক্মিণী-অঞ্জনা ৬১

অন্যান্য আকর্ষণ
ছবির মজা ২৫, আঁকো-শেখো ৩৩, ধাঁধা ৪৭, শব্দ সন্ধান ও মজার খেলা ৪৮

সম্পাদক : নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেডের পক্ষে বাক্সাদিত্য রায় কর্তৃক ৬, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০ ০০১ থেকে প্রকাশিত এবং আনন্দ অফসেট প্রাইভেট লিমিটেড পি ২৪৮ সি আই টি রোড কলকাতা ৭০০ ০৫৪ থেকে মুদ্রিত। দাম দু'টাকা পঞ্চাশ পয়সা বিমান মাশুল ত্রিপুরা ৫ পয়সা পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য স্থানে ১০ পয়সা পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা-অধিকার কর্তৃক অনুমোদিত শিশুপাঠ্য পত্রিকা।

আগামী সংখ্যায়

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ছড়া
সমরেশ মজুমদারের গল্প
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ও
বুদ্ধদেব গুহর উপন্যাস

"মা বলতো আমি গালে কি লাগিয়েছি ?"

"ঠিক বলেছ ! বোরোলীন ! তুমি বলো বোরোলীন লাগালে গায়ের চামড়া ভালো থাকে। তাইতো আমি মুখে, হাতে, পায়ে লাগিয়েছি। এবার আমাকে একটা হামু দাও।"

ছোটদের ত্বকের সুরক্ষার জন্য
সুরভিত অ্যান্টিসেপটিক ক্রীম

বোরোলীন

সাধারণ কাটা-ছড়ার জন্য
একটি কার্যকরী অ্যান্টিসেপটিক

জি ডি ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড আশা মহল কলকাতা ৭০০ ০৮৮

HTC-GDP-3760R

ভৌতিক

শঙ্খ ঘোষ

উলুক ঝুলুক শুলুক লতায়
কণ্টিকারির ফুল
হরেক রকম আল্‌সে কথা
পোড়ো বাড়ির ঝুল !

শ্যাওড়াগাছের টনক নড়া
বদ্যিভিটের ভূত
চাঁদনি জলে কুলপি গড়ায়
আস্ত তিরিশ ফুট।

ঢেউ লেগে তার বাঁশের বনে
ওঠে গানের ঝড়
শুনলে আসে সংগোপনে
কম্প-দেওয়া জ্বর।

ওঝা আসেন জ্বর তাড়াতে
শাপলা মুড়ি দিয়ে
উলুক ঝুলুক শুক্ল রাতে
খেঁকশেয়ালের বিয়ে।

দুইজন

তুলসী মুখোপাধ্যায়

হরিপদ হালদার
টেরি তার কী বাহার !
বাংলায় ফেল করে
যোগ দেন যাত্রায়
আর কী বা করবেন—
না নায়ক, না ভিলেন
গোঁফদাড়ি চেঁছে ফেলে
সখী সেজে নাচে গায় !

বনমালী মান্না
একদিন ঘুম ভেঙে
গোঁফ খুঁজে পান না !
সারারাত লাগাতার
সে কী তাঁর কান্না !
মা বলেন, বাছা রে
টাকা নে' হাজারে
যা চোরাবাজারে
গোঁফ কোথা পেয়ে যাবি
নিশ্চয়ই খোঁজ তার !

ছবি : দেবাশিস দেব

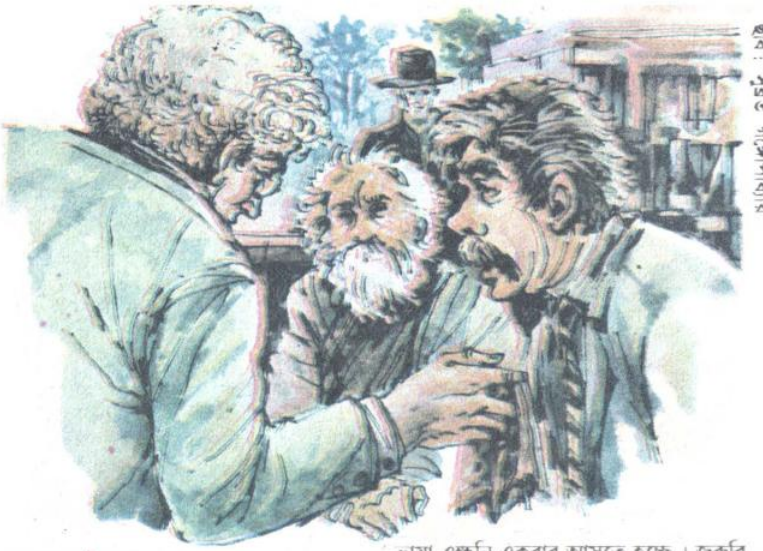

রুমাল

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

২১৮২ খ্রিষ্টাব্দের এক সকালে বৈজ্ঞানিক হলধর বসু তাঁর পটাশপুরের ল্যাবরেটরিতে একটা পারমাণবিক চুল্লির উপর বাটি বসিয়ে বাসি ডাল গরম করছিলেন। পান্তা ভাত আর বাসি ডাল তাঁর ভীষণ প্রিয়, বাটিটা নামিয়ে ফ্রিজ থেকে পান্তাভাত বের করে খেতে বসবেন এমন সময় টাইম-টেলিফোনটা বেজে উঠল, ভারী বিরক্ত হয়ে তিনি উঠে টেলিফোনটা তুলে বললেন, "কে ?"

ওপাশ থেকে বন্ধু গদাধরের গলা পাওয়া গেল, "হলধরভায়া নাকি ? আমি গদাধর, বাইশশো বিরাশি খ্রিষ্টাব্দের সাতুই জুলাই থেকে কথা বলছি।"

হলধর বললেন, "এই অসময়ে ডাকাডাকি কিসের ?"

"ডাকাডাকি কি আর সাধে ? তোমাকে ভায়া এক্ষুনি একবার আসতে হচ্ছে। জরুরি কাজ, সঙ্গে তোমার সেই রুমালখানা এনো।"

হলধর জানেন, গদাধর ছেঁদো লোক নয়। কাজ আছে বলেই ডেকেছে। তাই বললেন, "পান্তাটুকু খেয়েই যাচ্ছি।"

বলে ফোন রেখে দিয়ে খেতে বসলেন। কিন্তু খেতে বসেই মনে পড়ল, কাঁচালঙ্কা নেই। কাঁচালঙ্কা ছাড়া কি পান্তা খাওয়া যায়। কিন্তু মুশকিল হল গত একশো বছর পৃথিবীতে কাঁচালঙ্কা বা অন্য ধরনের সবজি হয়নি, হলধর তাই বরাবর তাঁর টাইম-গাড়িতে চেপে সোজা উনবিংশ বা বিংশ শতাব্দীতে গিয়ে হাজির হন এবং বেছেগুছে কাঁচালঙ্কা কিনে আনেন। চালডালও কিনে আনতে হয়। তবে এখনও তাঁর চালডালের স্টক ভালই আছে, শুধু লঙ্কা নেই, হলধর তাই বিরক্তমুখে ল্যাবরেটরির একপাশে একটা টানেলের মতো জায়গায় ঢুকে তাঁর বিদঘুটে টাইম-গাড়িটায় চেপে বসলেন। সুইচ টিপতে গাড়িটা সময়-সমুদ্রে পিছনবাগে

সাঁতার দিতে লাগল, সামনে একটা পর্দায় দ্রুত ২১৮১....২১৮০....২১৭৯ এবং ক্রমে ১৯৮২ ফুটে উঠতেই সুইচ টিপে গাড়ি থামিয়ে নামলেন হলধরবাবু। সামনেই পটাশপুর গাঁয়ের বাজার। আরও এক শতাব্দী পিছিয়ে যেতে পারলে সস্তায় পাওয়া যেত, কিন্তু তাতে সময় নষ্ট। সেরখানেক কাঁচালঙ্কা কিনে হলধর আবার টাইম-গাড়িতে চেপে ধাঁ করে চলে এলেন ২১৮২তে। পান্তা খেয়ে ঢেঁকুর তুলে একখানা রুমাল পকেটে পুরে আবার সেই টাইম-গাড়িতে চেপে বসলেন।

২২৮২ খ্রিষ্টাব্দের ৭ জুলাই তারিখে পৌঁছতে বেশি সময় লাগল না, গাড়ির দরজা খুলে নামতে দেখেন, সামনেই গদাধর দাঁড়িয়ে।

২২৮২ খ্রিষ্টাব্দটাকে বিশেষ পছন্দ হল না হলধরের, কারণ এখানেই মাত্র একশো বছরের তফাতে তাঁর ল্যাবরেটরিটা রয়েছে, কিন্তু এখন ল্যাবরেটরির কোনো চিহ্নই নেই। একটা বিচ্ছিরি জঙ্গুলে জায়গায় তাঁর গাড়িটা থেমেছে। পারতপক্ষে নিজের শতাব্দী এবং কাছেপিঠের সময় ছাড়া তিনি ভবিষ্যৎ শতাব্দীতে পা দেন না।

একটু খেঁকিয়ে উঠে হলধর বললেন, "এর মানে কী বলো তো! আমার ল্যাবরেটরিটা কি লোপাট হয়ে গেছে নাকি?"

গদাধর মিটিমিটি হেসে বললেন, "চটো কেন ভায়া? অসার মাটি, তেজস্ক্রিয়তা আর আবহাওয়া দূষণের ফলে শতখানেক বছর আগেই পৃথিবীর জনবসতি লোপাট হতে শুরু করে। নিজের ল্যাবরেটরির বাইরে তো আর পা রাখো না, তাই টেরও পাও না, মানুষ সব পৃথিবী ছেড়ে নক্ষত্রপুঞ্জের অন্যান্য বাসোপযোগী গ্রহে গিয়ে আস্তানা গেড়েছে। আছেও ভাল। এই শতাব্দীটা খুব নির্জন আর নিরিবিলি, পৃথিবীতে একটাও মানুষ নেই।"

হলধর চারদিককার বিচ্ছিরি চেহারার আগাছাগুলোর দিকে সন্দেহের চোখে চেয়ে বললেন, "এগুলো কী গাছ?"

"আমি নাম দিয়েছি অ্যাটমমারি, খুব ভাল গাছ হে। পৃথিবীর সব তেজস্ক্রিয়তা শুষে নিয়েছে, আবহাওয়া পরিস্রুত করেছে, প্রায় দেড়শো বছর একটানা খরার পর আবার বৃষ্টি নামছে আজকাল এই গাছেরই গুণে, পৃথিবী আবার বাসোপযোগী হয়েছে। আমরা চেষ্টা করছি এই সালেই আবার মানুষকে এখানে ফিরিয়ে আনতে। সেইজন্য এখানে আজ একটা মেলা বসানো হয়েছে। বিভিন্ন শতাব্দী থেকে জ্ঞানী-গুণীরা আসবেন। নিজের নিজের কৃতিত্ব দেখাবেন। বিজ্ঞানমেলায় তোমাকে দেখাতে হবে রুমালের খেলা।"

বেশিদূর যেতে হল না, মাইলখানেক হাঁটতেই বিশাল প্যাণ্ডেল নজরে পড়ল। বৈজ্ঞানিকরাও প্রায় সবাই হাজির। আর্কিমিডিসের পুরনো স্বভাব এখনো যায়নি, এক জায়গায় উঁচু হয়ে বসে মাটির ওপর কাঠি দিয়ে দাগ কেটে আঁক কষছেন। নিউটন তাঁর পোষা বেড়ালটা কোলে নিয়ে আদর করছেন একটা গাছের তলায় বসে। আইনস্টাইন একটা বাচ্চা ছেলের সঙ্গে স্লেটে কাটাকুটি খেলছেন। সত্যেন বোস একটা বেহালার বাক্স কোলে করে বসে আইনস্টাইনের খেলা দেখছেন। এঁদের সকলের সঙ্গেই ভাল আলাপ আছে হলধরের। টাইম-গাড়িতে পিছিয়ে গিয়ে তিনি প্রায়ই দরকারমতো এঁদের সঙ্গে আলোচনা করেন। বেশ ভাল লোক এঁরা। দেমাক-টেমাক নেই। দেমাক সব আধুনিক এবং ভবিষ্যৎকালের বৈজ্ঞানিকদের। তাঁদের তিনি দু চোখে দেখতে পারেন না। জগদীশ বোসকেও দেখা গেল, জঙ্গল থেকে অ্যাটমমারি গাছ কয়েকটা উপড়ে নিয়ে আসছেন, মুখে হাসি। বিজ্ঞানমেলা দেখতে বিভিন্ন শতাব্দী থেকে হাজার হাজার লোক এসেছে, ভিড়ে ভিড়াক্কার, বিভিন্ন গ্রহ

LINTAS-SU-253-1812 BG
হিন্দুস্থান লিভার-এর একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন

থেকে ক্রমাগত মহাকাশযান এসে নামছে ল্যানডিং প্যাডে, বিভিন্ন যুগ থেকে টাইম-গাড়িও এসে জড়ো হয়েছে মেলায়, হলধর যখন হলঘরের মতো বিশাল মঞ্চে ঢুকলেন, তখন ২৩৮২ খ্রীষ্টাব্দের এক বৈজ্ঞানিক তাঁর অদ্ভুত আবিষ্কার দেখাচ্ছেন। টেবিলের ওপর ছোট্ট একটা পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটালেন তিনি, ছত্রাকটা ব্যাঙের ছাতার মতোই একটুখানি উঁচুতে উঠল মাত্র। আবিষ্কারটার নাম বৈজ্ঞানিক দিয়েছেন বানসাই পারমাণবিক বিস্ফোরণ। মাত্র ছ ইঞ্চি উঁচু এবং চার ইঞ্চি ব্যাসের সেই পারমাণবিক বিস্ফোরণের পকেট সংস্করণ দেখে সকলেই সবিস্ময়ে হাততালি দিল। পঞ্চবিংশ শতাব্দীর এক বৈজ্ঞানিক দেখালেন পঞ্চভূতের খেলা। ছোট্ট একটা যন্ত্রে ক্ষিতি অপ তেজ মরুৎ ব্যোম মিশিয়ে চোখের পলকে একটা জ্যান্ত মানুষ তৈরি করলেন তিনি। তারপর আবার কয়েক মিনিট বাদে তাকে পঞ্চভূতে মিশিয়ে দিলেন।

আর্কিমিডিস আইনস্টাইনকে একটা ঠেলা দিয়ে বললেন, "কেমন বুঝছ ?"

আইনস্টাইন মাথা চুলকে বললেন, "বিজ্ঞানের খুব উন্নতি হয়েছে।"

আর্কিমিডিস ধমক দিয়ে বললেন, "ছাই হয়েছে, বিজ্ঞান আর ম্যাজিক যে এক জিনিস হয়ে গেল হে ছোকরা !"

কথাটা হলধরের কানে গিয়েছিল। ঘাবড়ে গিয়ে ঘনঘন রুমাল দিয়ে মুখ মুছলেন তিনি। যখন নিজের আবিষ্কার দেখানোর ডাক পড়ল তাঁর, তখন বেশ ভয় ভয় করছিল। রুমাল দিয়ে মুখ মুছতে মুছতেই তিনি মঞ্চে গিয়ে উঠলেন। তারপর রুমালটা খুলে বাতাসে ভাসিয়ে দিলেন। আশ্চর্য, রুমালটা ভাসতেই লাগল। শুধু তাই নয়, হলধর সেই রুমালটার ওপর উঠে বসলেন এবং রুমালটা তাঁকে নিয়েই শূন্যে ভাসতে ভাসতে ঘুরে বেড়াতে লাগল।

খুবই হাততালি পেলেন হলধর। কিন্তু সিটে ফিরে এসে দেখলেন তাঁর রুমালের খেলাটাকে আদৌ গুরুত্ব না দিয়ে আর্কিমিডিস এবং নিউটন আপেক্ষিক গুরুত্ব এবং মাধ্যাকর্ষণ নিয়ে গভীর আলোচনায় মগ্ন। আইনস্টাইন আর সত্যেন বোস বেহালা বাজানোর উপকারিতা সম্পর্কে নিজেদের মত বিনিময় করছেন। জগদীশ বোস গ্যালিলিওর সঙ্গে কী নিয়ে যেন কথা বলছিলেন, ভাল শোনা যাচ্ছিল না। তবে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র খুব মৃদু স্বরে অটো হানকে বোঝাচ্ছিলেন যে, চা খাওয়া মোটেই ভাল নয়।

হলধর তাঁর রুমালে মুখ মুছলেন।

সামনের সিটে বসা আর্কিমিডিস হঠাৎ 'উঃ' করে চেঁচিয়ে উঠলেন, নিউটনের বেড়ালটা পায়ের কাছে ঘুরঘুর করছিল, হঠাৎ কামড়ে দিয়েছে, বেশ রক্ত পড়ছে গোড়ালি থেকে।

জগদীশ বোস ব্যস্তসমস্ত হয়ে হলধরের দিকে হাত বাড়িয়ে বললেন, "রুমালটা দাও তো।"

"রুমাল !" বলে আর্তনাদ করে উঠলেন হলধর।

"শিগগির দাও।" বলে একরকম পকেট থেকে নিজেই তুলে নিলেন রুমালটা, তারপর হাঁটু গেড়ে বসে আর্কিমিডিসের ক্ষতস্থানটা রুমাল দিয়ে সযত্নে বেঁধে দিলেন জগদীশ বসু। করুণ চোখে চেয়ে রইলেন হলধরবাবু। অ্যান্টিগ্রাভিটি সলিউশন লাগানো ছিল রুমালে। সেটা বোধহয় গেল।

জগদীশ বোস উঠে এসে হলধরের সামনে দাঁড়ালেন। কাঁধে স্নেহভরে একখানা হাত রেখে বললেন, "বাপু হে, তোমার জাদু-রুমালের খেলাটা খুব খারাপ ছিল না ঠিকই, তবু বলি আর্কিমিডিসের পায়ের ছোঁয়ায় রুমালটা ধন্য হল এতদিনে।"

হলধরবাবু বিনীতভাবে বললেন, "যে আজ্ঞে।"

ত্বক সুন্দর নির্মল, নববধূ সম উজ্জ্বল!
ক্লিয়ারাসিল ব্রণর মুখ খোলে,
পরিষ্কার করে আর ছড়িয়ে পড়া রোধ করে।
ব্রণ বেরোলে অনেকেই তো অনেক রকম উপদেশ দিয়ে থাকেন। কিন্তু কাজের উপদেশের জন্যে শুনুন পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ কিশোর কিশোরীরা ক্লিয়ারাসিলের উপকারীতা সম্বন্ধে কি বলেন। ক্লিয়ারাসিল....নিরাপদ আর সুবিধেজনক ওষুধ– যার বিশেষত্বই হ'ল আপনার ব্রণর সমস্যার সমাধান করা। এখন ক্লিয়ারাসিলের সাহায্যে কতখানি ব্রণ পরিষ্কার আর রোধ করবেন তা আপনার ওপর নির্ভর করছে।
কি ক'রে দেখুনঃ
• প্রতিদিন সকালে আর সন্ধ্যায় ক্লিয়ারাসিল ব্যবহার করুন।
• ক্লিয়ারাসিল সারা মুখে লাগান। ব্রণর জায়গায় একটু বেশী পরিমাণে লাগান।
• ব্রণ পরিষ্কার হয়ে গেলেও ক্লিয়ারাসিল ব্যবহার করতে থাকুন কারণ ক্লিয়ারাসিল অতিরিক্ত তেলাভাব শুষে নিয়ে ব্রণ রোধ করে।
অদ্বিতীয় ৩-ভাবে ক্রিয়া
শুধু ক্লিয়ারাসিলই তিনভাবে কাজ করে।
১। ব্রণর মুখ খুলে দেয়—ক্লিয়ারাসিলের বিশেষ কার্যকলাপ ব্রণর মুখ খুলতে সাহায্য করে।
২। ব্রণ পরিষ্কার ক'রে দেয়—ব্রণর ময়লা বার ক'রে দিতে সাহায্য ক'রে, ফলে ক্ষতিকর-ভাবে টিপে বার করতে হয় না।
৩। ব্রণ শুকিয়ে দেয়—অতিরিক্ত তেলাভাব শুষে নিয়ে ব্রণ পরিষ্কার করতে সাহায্য করে।
Clearasil
Clearasil
মুখখানিতে ফুটে উঠলে স্নিগ্ধ লাবণ্য, জীবনের প্রতিপল মনে হবে ধন্য।
বিশ্বের '১' নম্বর ব্রণর ক্রীম
OBM 2115 R BN

জঙ্গলগড়ের চাবি

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

আগে যা ঘটেছে : কাকাবাবুকে গুলি করে পালিয়েছিল আততায়ীরা। অনেক চিকিৎসার পর কাকাবাবু বেঁচে উঠলেও পঙ্গু হয়ে গেলেন। হাত নাড়তে পারেন না, নিজে খেতেও পারেন না। এমন-কী কাকাবাবুর মাথারও গোলমাল দেখা দিয়েছে, ওঁর অনেক কথাই বুঝতে পারা যায় না। কাকাবাবুর স্বাস্থ্য সারাবার জন্য তাঁকে আগরতলায় নিয়ে এসে সন্তু খুব বিপদে পড়ে গেছে। কাকাবাবু ওকে চিনতে পারছেন না। এদিকে ডলি নামে একটি তরুণী মেয়ে এসে পরিচয় দিল যে, সে সন্তুর মাসতুতো বোন। সে কাকাবাবু আর সন্তুকে তাদের বাড়িতে নিয়ে যেতে চায়। সেই সময়ই ত্রিপুরার দু'জন সরকারি অফিসার এসে পড়লেন এবং ডলিকে ধরে ফেললেন। সে আসলে একটি জেল-খাটা মেয়ে। সন্তুদের সার্কিট হাউস থেকে সরিয়ে মহারাজার এক গেস্ট হাউসে নিয়ে আসা হল। সেখানে বাগানে বেড়াতে বেড়াতে সন্তু দেখতে পেল একটা সাপ। তারপর—

॥ ১০ ॥

সন্তু তো আর সাধারণ শহরের ছেলেদের মতন নয় যে, সাপ দেখেই ভয়ে আঁতকে উঠবে! সে কত দুর্গম পাহাড় আর কত গভীর জঙ্গলে গেছে, সাপ-টাপ দেখার অভিজ্ঞতা তার অনেক আছে।

সাপটার চোখের দিকে তাকিয়ে সন্তু একেবারে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। ফুল দেখতে দেখতে অন্যমনস্ক হয়ে আর একটু হলেই সে সাপটাকে মাড়িয়ে দিত। তা হলেই হয়েছিল আর কী!

সেবার আন্দামানে যাবার পথে কাকাবাবু সন্তুকে সাপ সম্পর্কে অনেক কিছু জানিয়ে দিয়েছিলেন। তাই সন্তু জানে, যে সাপ ফণা তুলতে পারে, সে সাপের বিষ থাকে। তা হলেও বিষাক্ত সাপ চট করে মানুষকে কামড়ায় না। মানুষ তো আর সাপের খাদ্য নয়। চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকলে সাপ নিজে থেকেই চলে যায়।

কিন্তু এই সাপটা তো যাচ্ছে না। সন্তুর দিকেই ফণাটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে একটু একটু দুলছে। চিড়িক চিড়িক করে বেরিয়ে আসছে তার লম্বা জিভটা। এবারে সন্তুর গায়ে ঘাম দেখা গেল।

সাপটার দিকে চোখ রেখে সন্তু খুব সাবধানে আস্তে-আস্তে তার পাঞ্জাবির বোতামগুলো খুলতে লাগল! তারপর বিদ্যুৎগতিতে পাঞ্জাবিটা খুলে ফেলেই ছুঁড়ে মারল সাপটার গায়ে। সাপটা অমনি পাঞ্জাবিটার মধ্যে পাক খেতে-খেতে ছোবল মারতে লাগল বারবার।

সন্তু এই সুযোগে সরে গেল অনেকটা দূরে। এই কায়দাটাও কাকাবাবুর কাছ থেকে শেখা। ছোটখাটো লাঠি কিংবা পাথর ছুঁড়ে সাপ মারার চেষ্টা না করে গায়ের জামা ছুঁড়ে মারলে অনেক বেশি কাজ হয়। সাপটার যত রাগ পড়েছে ঐ পাঞ্জাবিটার ওপরে, ওটার মধ্যে কুণ্ডলি পাকিয়ে ছোবল মেরে যাচ্ছে বারবার।

সন্তুর ভাবভঙ্গি দেখে বারান্দায় বসে-থাকা পুলিশ দু'জনের কী যেন সন্দেহ হল। একজন উঠে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে, খোকাবাবু?"

এই খোকাবাবু ডাকটা শুনলে সন্তুর গা জ্বলে যায়। আর ক'দিন বাদে সে কলেজে পড়তে যাবে, এখনো সে খোকাবাবু!

যেন কিছুই নয়, একটা আরশোলা বা গুবরে পোকা, এইরকম তাচ্ছিল্য দেখিয়ে

সন্তু বলল, "কুছ নেহি, একঠো সাপ হ্যায় !"

ত্রিপুরায় সবাই বাংলায় কথা বলে, তবু সন্তু হিন্দিতে কেন জবাব দিল কে জানে ! বোধহয় পুলিশের সঙ্গে কথা বলতে গেলে আপনিই হিন্দি এসে যায় !

"সাপ !" একজন পুলিশ খানিকটা অবিশ্বাসের সঙ্গে বাগানের মধ্যে নেমে এসে বলল, "কোথায় ?"

সন্তু আঙুল দিয়ে পাঞ্জাবিটা দেখিয়ে দিয়ে বলল, "ঐ যে !"

এবারে পুলিশটি চমকে উঠে বলল, "বাপ রে ! সত্যিই তো সাপ ! লাঠি, লাঠি কোথায় । এই শিবু, লাঠি আনো !"

তখন অনেকে দৌড়ে এল ।

সাপেরা এমনিতে কানে কিছুই শুনতে পায় না । কিন্তু লোকজন চলার সময় মাটিতে আর হাওয়ায় যে তরঙ্গ হয়, সেটা ঠিক শরীর দিয়ে টের পায় । একসঙ্গে অনেক লোকের পায়ের ধুপধাপে সাপটা বুঝে গেল যে, বিপদ আসছে । এবারে সে পাঞ্জাবিটা ছেড়ে সরসর করে ঢুকে পড়ল পাশের একটা ঝোপে ।

পুলিশ দু'জন আর রান্নার লোকটি সেই ঝোপটায় লাঠিপেটা করতে লাগল । সেই লাঠির চোটে আহত হল কয়েকটা ফুলগাছ, সাপের গায়ে লাগল না । সন্তু দেখতে পেয়েছে সাপটা একটা গর্তে ঢুকে পড়েছে । সাপেরা কিন্তু বেশ বোকা হয় । গর্তের মধ্যে প্রথমে ঢুকিয়ে দেয় মুখটা, লেজের দিকটা অনেকক্ষণ বাইরে থাকে । যে-কেউ তো লেজটা ধরে টেনে তুলতে পারে ।

পুলিশরা ফুলের ঝোপে তখনও লাঠি পিটিয়ে যাচ্ছে, এমন সময় হৈহৈ করে ছুটে এল বাগানের মালি । সাপের ব্যাপারটায় সে কোনো গুরুত্বই দিল না, ফুলগাছ নষ্ট হচ্ছে বলে সে খুব রাগারাগি করতে লাগল । ওটা নাকি বাস্তুসাপ, কারুকে কামড়ায় না ।

সন্তু অবশ্য বাস্তুসাপের ব্যাপারটা বিশ্বাস করল না । গায়ে পা পড়লেও সাপটা কামড়াত না ? তা কখনো হয় ! তা হলে তার জামার ওপর অত ছোবল মারল কেন ? আর তার বাগানে আসার শখ নেই ।

মালি সন্তুর পাঞ্জাবিটা মাটি থেকে তুলতে যেতেই সন্তু বলল, "ছোঁবেন না, ওটা ছোঁবেন না, ওতে সাপের বিষ আছে !"

মালি কিন্তু বিষের কথা শুনেও ঘাবড়াল না । বলল, "আপনার জামা ? ও কিছু হবে না, একটু ধুয়ে নিলেই ঠিক হয়ে যাবে ।"

সন্তু অবশ্য আগেই ঠিক করে ফেলেছে যে, ও জামা সে আর গায়ে দেবে না । সাপের বিষ-মাখা জামা কেউ গায় দেয় ? সে ওটা আর ছুঁয়েই দেখবে না ।

মালি জামাটা তার দিকে এগিয়ে দিতেই সন্তু বলল, "ওটা আমার চাই না ।"

তারপরই সে দৌড়ে চলে গেল ওপরে । এত বড় একটা খবর কাকাবাবুকে না জানালে চলে !

কিন্তু কাকাবাবুর সঙ্গে দু'একটা কথা বলেই তার উৎসাহ চুপসে গেল । কাকাবাবুর যেন এ-ব্যাপারে কোনো আগ্রহই নেই ।

সন্তু বলল, "কাকাবাবু, সাপ ! এই অ্যাত্ত বড় !"

ইচ্ছে করেই সন্তু সাপের সাইজটা একটু বাড়িয়ে দেখাল, কিন্তু কাকাবাবু শুকনো মুখে তাকিয়ে রইলেন । সন্তু আবার বলল, "ঠিক আমার পায়ের কাছে, আর একটু হলেই কামড়ে দিত !"

কাকাবাবু তবু কোনো কথা বললেন না । যেন শুনতেই পাচ্ছেন না । মনে হল কোনো কারণে কাকাবাবুর খুব মন খারাপ ।

সন্তুরও মন খারাপ হয়ে গেল । সাপটা যদি তাকে কামড়ে দিত, তা হলে কী হত ? সন্তু মরেও যেতে পারত । সাপে কামড়ালেই অবশ্য সব সময় মানুষ মরে না, তাড়াতাড়ি হাসপাতালে চিকিৎসা করালে সেরে যায় । কিন্তু হাসপাতাল-টাসপাতাল

সন্তুর খুব বিচ্ছিরি লাগে। সে মরে গেলে কিংবা হাসপাতালে শুয়ে থাকলে কাকাবাবুর দেখাশুনো করত কে ? কাকাবাবুর মাথার একেবারে ঠিক নেই !

সন্তু বারান্দার রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে রইল অনেকক্ষণ। তারপর দেখল রিকশা করে একজন মহিলা এসে সামলেন গেটের কাছে। একটু বাদেই একজন পুলিশ সেই মহিলাকে সঙ্গে করে নিয়ে এল ওপরে।

সেই মহিলা একজন নার্স। দেববর্মনবাবু এঁকে পাঠিয়েছেন। বেশ শক্ত-সমর্থ চেহারা মহিলার, কাজে বেশ পটু মনে হয়। সন্তু তাঁকে কাকাবাবুর অসুবিধেগুলো বুঝিয়ে দিল। কাকাবাবুও বেশ শান্ত ভাবে মেনে নিলেন এই নার্সের ব্যবস্থা। সন্তু অনেকটা নিশ্চিন্ত হল।

দুপুরবেলা শুয়ে শুয়ে সন্তুর মনে হল, এখানে পড়ে থাকার কোনো মানে হয় না। কাকাবাবুকে নিয়ে এখন ফিরে যাওয়াই ভাল। কাকাবাবু যদি নিজেই কোনো নির্দেশ না দেন, কখন কী করতে হবে বলে না দেন, তা হলে আর এখানে থাকার কোনো মানে হয় না। বরং কলকাতায় গিয়ে কাকাবাবুর চিকিৎসা করানো দরকার। বিকেলবেলা গভর্নমেন্টের লোকেরা এলেই সন্তু এই কথা বলবে।

বিকেলবেলা ওঁরা আসবার আগেই আর একজন এলেন, যাঁকে দেখে সন্তু খুব খুশি হয়ে উঠল। এঁর নাম নরেন্দ্র ভার্মা, দিল্লির খুব বড় অফিসার, কাকাবাবুর অনেক দিনের বন্ধু। নরেন্দ্র ভার্মা এসে গেছেন, আর সন্তুর কোনো চিন্তা নেই।

ভার্মাকে জিপ থেকে নামতে দেখেই সন্তু ওঁকে অভ্যর্থনা করবার জন্য নীচে নেমে গেল। ভার্মা কলকাতায় পড়াশুনো করেছেন বলে বাংলাও মোটামুটি বলতে পারেন।

সন্তুকে দেখে ভার্মা বললেন, "আরে আরে সন্টুবাবু, কেমুন আছ ? সব ভাল তো ?"

ভার্মা সন্তুকে জড়িয়ে নিজের কাছে টেনে নিলেন। ভার্মা খুবই লম্বা মানুষ, নস্যি-রঙের সাফারি সুট পরে আছেন, তাঁর চোখ দুটো খুব তীক্ষ্ণ।

সন্তু অভিমানভরা গলায় বলল, "না নরেনকাকা, এবারে কিছুই ভাল না। সব গণ্ডগোল হয়ে যাচ্ছে।"

ভার্মা বললেন, "হ্যাঁ, আমি কিছু কিছু শুনেছি। আমি দুপুরে এসে পৌঁছেই সার্কিট হাউসে গেলাম তোমাদের ঢুঁড়তে। তোমাদের না পেয়ে ফোন করলাম দেববর্মনকে। তার কাছে শুনলাম কি এর মধ্যেই রায়চৌধুরীকে স্নাচ্ করার অ্যাটেম্পট হয়ে গেছে। বড় তাজ্জব কথা। আগরতলায় আমিই তোমাদের পাঠাতে বলেছি, এখানকার কোনো লোকের তো জানবার কথা নয়।"

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "এত জায়গা থাকতে আমাদের এই আগরতলাতেই পাঠালেন কেন ?"

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে ভার্মা বললেন, "ত্রিপুরার কথা তোমার কাকাবাবু খুব বলাবলি করছিলেন এখন। মানে ত্রিপুরাতে উনি কী যেন একটা ধান্দা করেছিলেন।

তাই আমরা ভাবলাম কী, উনি ত্রিপুরাতে হাজির হয়ে শরীরটা সারিয়ে নিন আর এখানে কিছু খোঁজখবরও নিন। একটা গুড় নিউজ দিই সন্টুবাবু তোমাকে, যে বদমাশটা তোমার কাকাবাবুকে গুলি করেছিল, সে ধরা পড়ে গেছে।

"ধরা পড়েছে ? সে কী বলল ? কেন গুলি করেছিল ?"

"লোকটা গুংগা...মানে কী যেন বলে, হ্যাঁ, বোবা !"

"বোবা ? যাঃ !"

"তাতে কোনো অসুবিধা নেই। ওকে কে পাঠিয়েছিল সে কানেকশান আমরা ঠিক বার করে নিব।"

"নরেনকাকা, এখানে কাকাবাবুর কোনো চিকিৎসা হচ্ছে না। এখন আমাদের কলকাতায় ফিরে গেলে ভাল হয় না ?"

"কলকাতার জন্য মন ছটফট করছে ? কেন, ঘুড়ি উড়াবার সিজন বুঝি ? আচ্ছা রায়চৌধুরীকে জিজ্ঞেস করে দেখি !"

কাকাবাবু পিঠের নীচে দুটো বালিশ দিয়ে আধ-বসা হয়ে দেয়ালের দিকে তাকিয়ে আছেন।

ঘরের মধ্যে পা দিয়ে নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "এই যে রাজা, কেমন আছ ? তবিয়ত তো বেশ ভালই দেখছি !"

কাকাবাবু মুখ ফিরিয়ে ব্যঙ্গের সুরে বললেন, "এ আবার কে ? এই লম্বা ধ্যাড়েঙ্গা লোকটা কোথা থেকে এল ?"

ভার্মা যেন বুকে একটা ঘুসি খেয়ে থমকে গেলেন। তাঁর সারা মুখে ছড়িয়ে পড়ল বিস্ময়। তিনি আস্তে-আস্তে বললেন, "রাজা, আমি নরেন্দ্র, আমায় চিনতে পারছ না ?"

কাকাবাবু বললেন, "নরঃ নরৌ নরাঃ আর ফলম্ ফলে ফলানি ! আর একটা আছে, সা-রে-গা-মা-পা-ধা-নি, গানের আমি কী জানি ! আসলে কিন্তু আমি সব জানি ! আমায় কেউ ঠকাতে পারবে না।"

নরেন্দ্র ভার্মা হতভম্ব মুখে বললেন, "এটা কী ব্যাপার ! তুমি কী বলছ, রাজা !"

সন্তু ম্লান গলায় বললেন, "কাকাবাবু কোনো কথা বুঝতে পারছেন না। ঐ গুলি খাওয়ার জন্য বোধহয় মাথায় গোলমাল দেখা দিয়েছে।"

"সর্বনাশ !"

কাকাবাবু আবার ঠাট্টা করে বললেন, "কী সর্বনাশ ? কেন সর্বনাশ ? কার সর্বনাশ ? তুমি সর্বনাশের কী বোঝো হে ছোকরা !"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "এ যে খুব খারাপ কেস।"

কাকাবাবু কটমট করে তাকিয়ে রইলেন ওঁর দিকে।

নরেন্দ্র ভার্মা জাদুকরের ভঙ্গিতে একটা হাত সামনে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, "আমি হিপনোটিজম জানি। দেখি তাতে কোনো কাজ হয় কি না ! রাজা, আমার চোখের দিকে তাকাও ! এবার মনে করার চেষ্টা করো, তুমি কে ? মনে করো দিল্লির কথা...তুমি দিল্লিতে গত মাসে আমায় কী বলেছিলে...ডিফেন্স কলোনিতে আমার বাড়িতে...সেদিন খুব বৃষ্টি পড়ছিল..."

উনি এক পা এক পা করে এগিয়ে কাকাবাবুর চোখের সামনে হাতটা নাড়তে লাগলেন।

কাকাবাবু একবারও চোখের পলক না ফেলে একই রকম গলায় বললেন, "বাঃ, বেশ নাচতে জানো দেখছি। এবার ধেই ধেই করে নাচো তো ছোকরা !"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "আশ্চর্য, কোনো কাজ হচ্ছে না কেন ? আচ্ছা, এক কাজ করা যাক, ঘর অন্ধকার করতে হবে। সন্টু, জানলা-দরোয়াজা বন্ধ করে দাও, আর তোমরাও বাইরে গিয়ে অপেক্ষা করো।"

নার্সকে সঙ্গে নিয়ে সন্তু চলে গেল বাইরে। নরেন্দ্র ভার্মা ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিলেন। (ক্রমশ)

ফ্ল্যাশ গর্ডন

অচেনা সৌরজগতে ঢুকে পড়েছে ডঃ জারকভের মহাকাশ-ক্যাপসুল। প্রতিটি গ্রহের পরিমন্ডলের রং সেখানে আলাদা। আর্বোরিয়ার পরিমন্ডল গোলাপি, ফ্রেজিয়ার পরিমন্ডল হিরের মতো ঝকঝকে, আর বৃহত্তম গ্রহ মঙ্গোর পরিমন্ডল বেগনি।

মহাকাশযান অগ্নিবলয়ের দিকে এগোচ্ছে, ক্লিটাস ...

নিরাপদে ওকে নামিয়ে আনো।

বেগনি বাষ্প-বলয়ের মধ্য দিয়ে ডঃ জারকভের ক্যাপসুল কিম্ভূত এক গ্রহে গিয়ে নামছে ...

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

রোভার্সের রয়
রয় আবার প্লেয়ার-ম্যানেজার। কেলবার্নের বিরুদ্ধে রোভার্স আজ দুর্দান্ত খেলছে। রয় করেছে হ্যাটট্রিক।
কেলবার্ন আজ ক গোল খাবে রে?
গোলের রেকর্ড হবে আজ!
রোভার্সের রয়
রেকর্ডটা কী?
১৯৪৯ সনে পোর্টডীন ১২-২ গোলে হেরেছিল!
চার গোলে জিতছি! আর নটা গোল চাই!
আবার গোল!
রয়ের কটা হল?
তিনটে। নাকি চারটে?
গো-ও-ও-ও-ল!
এটা নিয়ে পাঁচটা!
রোভার্স ৬, কেলবার্ন ০
কেলবার্ন পালটা-আক্রমণ চালাচ্ছে, কিন্তু চার্লি দুর্ভেদ্য।
বাঁচিয়েছে!
শাবাশ চার্লি!
রোভার্স আবার গোল দিল
সাত গোল! এটা ব্ল্যাকির!
পরের গোল নোয়েলের
আট গোল!
রয়ের পাস নোয়েল কাজে লাগিয়েছে!

রয় কি তাহলে সত্যিই বসরানে যাচ্ছে ?

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

সদাশিব

দৌড়োদৌড়ি কাণ্ড

চিত্রনাট্য : তরুণ মজুমদার
ছবি : বিমল দাশ

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

আমার জন্মদিনে
ভাইয়ের দেওয়া উপহার...

ইউকোব্যাঙ্কে তার জমানো হাতখরচের টাকা থেকেই।

সত্যিই কি সুন্দর ট্রান্‌জিস্টার কিনেছে আমার জন্য। ইউকোব্যাঙ্কে জমানো হাতখরচের টাকা থেকেই সে এটা কিনেছে।

এই ব্যাঙ্কে টাকা বেড়েই চলে। কারণ এই ব্যাঙ্কে টাকা রাখলে ওঁরা তোমাকে আরো বেশি টাকা দেবেন। ওঁরা একে বলেন সুদ।

তোমার হাতখরচের টাকা বাড়িয়ে নেবার কি চমৎকার রাস্তা, তাই না?

ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক

ইউকোব্যাঙ্ক কাছেই আছে, ইউকোব্যাঙ্কে টাকা জমান

UCO/CAS-109/82 BEN

রুআহা

বুদ্ধদেব গুহ

আগে যা ঘটেছে ঋজুদা, রুদ্র ও তিতির আফ্রিকায় এসেছে ভূষুণ্ডার খোঁজে। ডার এস সালামের এক হোটেলে ওঠার পর থেকে ছদ্মবেশে আরুশার প্লেনে চাপা পর্যন্ত ঘটনার পর ঘটনার চমক। মিঃ শাহর বাংলোবাড়িতে নেমন্তন্ন, বাংলোর পিছনের রহস্যময় বাগানে রহস্যময় এক নিগ্রো, তার বলা গল্পটির মধ্যে কিসের ইঙ্গিত ? হোটেলে তিতিরের ঘরে তীর-গাঁথা চিঠিই বা কে রেখে গেল ? একটা রেস্তোরাঁয় এক অজানা ফোটোগ্রাফার হঠাৎ ওদের একটা ছবি তুলল। দুদিন পরে ওরা প্লেনে বসে দেখল, সেই ছবি কাগজের প্রথম পাতায়। তারপর

॥ ৬ ॥

ঘুম তিনজনেরই বোধহয় বেশ ভালই এসেছিল। এয়ার হোস্টেস সোয়াহিলি অ্যাকসেন্ট-মেশা খ্যানখ্যানে ইংরিজিতে যখন প্লেনের যাত্রীদের জানাল যে প্লেন এক্ষুনি কিলিম্যানজারো ইন্টারন্যাশনাল্ এয়ারপোর্টে নামবে, তখনই সকলের ঘুম ভেঙে গেল।

এয়ারপোর্টের কাছেই মোশি। পুব-উত্তরে গেলে, কিবো হয়ে, মাউন্ট কিলিম্যানজারো। পশ্চিম-দক্ষিণে আরুশা। যেখানে আমরা যাব।

প্লেনটা নামতেই চোখ জুড়িয়ে গেল। একেবারে টারম্যাকের পিছনেই পলুমামার টাক-মাথার মতো বরফ-ঢাকা কিলিম্যানজারো। মনে হচ্ছে, হাত বাড়ালেই ধরা যাবে। তিতির, সরি, মিস ভ্যালেরি, উত্তেজনায় আমার কোমরের কাছে কুটুস করে চিমটি কেটে দিল একটা। কানের কাছে ফিসফিস করে বলল, "আর্নেস্ট হেমিংওয়ে স্নোজ অব কিলিম্যানজারো।"

ঋজুদা বলে দিয়েছিল, নেমে আমরা কেউই কাউকে চিনব না। প্রত্যেকে আলাদা আলাদা ট্যাক্সি নিয়ে মাউন্ট মেরু হোটেলে গিয়ে পৌঁছোব আরুশাতে। হোটেলে চেক-ইন করে কোনো কায়দায় জেনে নেব, কে কত নাম্বার ঘরে আছি। তারপর, ডাইনিংরুমে আলাদা আলাদা ডিনার খেয়ে ঋজুদার ঘরে রাত দশটার সময় মিটিং।

এয়ারপোর্টের ভিতরটাও দারুণ। ঝকঝকে পালিশ-করা কাঠের মেঝে, ঝাঁক-ঝাঁক ফুটফুটে, অল্পবয়সী ইয়োরোপিয়ান ছেলেমেয়ের 'হাই'-'হাই' চিৎকারে ব্লাডপ্রেসার হাই হয়ে যাওয়ার উপক্রম সকলেরই।

সকলেই দেখি, আমার সামনে এসেই কেমন ভড়কে-যাওয়া মুখ করে পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে, রাস্তায় পচা-ইঁদুর পড়ে থাকলে আমরা যেমন করি, কলকাতায়। ব্যাপার বুঝলাম, জেন্টস্-রুমে গিয়ে। আমার ফলস্ দাঁতটা আধখানা ঝুলে গেছে। বড়ই ব্যথা পেলাম নিজের মূর্তি দেখে। এক্সট্রিমলি গুডলুকিং মিস ক্রিস ভ্যালেরি এবং সর্দার গুরিন্দার সিং-এর দিকে একবারও না-তাকিয়ে মনের দুঃখে বেরিয়ে পড়লাম ট্যাক্সি নিয়ে।

আমাদের দেশেরই মতো কুঁড়েঘর, ন্যাংটা ছেলেমেয়ে, ন্যুব্জ গরিব বুড়োমানুষ, টায়ার-সোলের জুতো-পরা। মকাইয়ের খেত, তেঁতুলগাছ। একই রকম দারিদ্র্য, হতাশা। তারই মধ্যে জুইক্-জুইক্ শব্দ করে দুধসাদা এয়ারকণ্ডিশাণ্ড মার্সিডিস গাড়ি করে কফি প্ল্যান্টেশনের এশিয়ান, আফ্রিকান বা ইয়োরোপিয়ান মালিকরা অন্য

ছবি : অনুপ রায়

গ্রহের বাসিন্দাদের মতোই চলে যাচ্ছেন।

গতবার ডার-এস-সালাম থেকে সোজা সেরেঙ্গেটিতে ছোট্ট প্লেনে করে পৌঁছে যাওয়ায়, আফ্রিকার জনপদ দেখার সুযোগ ঘটেনি। এবারে সেই সুযোগ ঘটল।

এয়ারপোর্ট থেকে আরুশা অনেক মাইল পথ। পৌঁছোলাম যখন, তখন শেষ-বিকেল। ভাল ঠাণ্ডা। গাছপালা, শহরের মধ্যে খুব একটা বেশি নেই। বেশ উঁচু পাহাড়ি শহর। এখানে-ওখানে আকাশমণি গাছে সুন্দর কমলা-রঙা ফুল এসেছে। এই ফুলগুলিকেই বলে আফ্রিকান টিউলিপ। শান্তিনিকেতনে এই গাছ অনেক আছে। এখন আফ্রিকাতে শীতকাল। এ অঞ্চলে তো বেশ ভালই শীত। প্রায় দার্জিলিঙেরই মতো। শহরের দিকে উঁচু মাথা ঝুঁকিয়ে চেয়ে দেখছে মাউন্ট মেরু। ঐ উঁচু পাহাড়ে মাসাইদের বাস। আমাদের বন্ধু নাইরোবি-সর্দারের কাজিনরাই থাকে হয়তো।

ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে চেক-ইন করছি হোটেলে, হঠাৎ এক্কেবারে ভুষুণ্ডার সঙ্গেই মুখোমুখি দেখা। ভূত দেখলেও এত চমকাতাম না। একটা ছাইরঙা উর্স্টেড ফ্ল্যানেলের বিজনেস্-স্যুট পরেছে। মুখে মীরশ্যাম পাইপ। আমি তো দেখে থ। হালচালই 'পালটে গেছে।

ওকে দেখেই আমার হাত নিশপিশ করতে লাগল।

আমার দিকে তাকিয়েই ও মুখ ঘুরিয়ে নিল। হৃৎপিণ্ড ধক্ করে উঠল। পরক্ষণে বুঝতে পারলাম, রুদ্রকে চিনতে পারেনি ভুষুণ্ডা। জন অ্যালেনের এমন সুন্দর চেহারা দেখে ভিরমি লেগেছে কুৎসিত ভুষুণ্ডারও।

মাউন্ট মেরু আরুশার সবচেয়ে ভাল

হোটেল। সেই হোটেলেও দেখলাম ভুষুণ্ডাকে সকলে বেশ খাতির-টাতির করছে। মোটা বকশিশ দেয় সকলকে নিশ্চয়ই।

আড়চোখে তাকালে সন্দেহ হতে পারে, তাই আমি সোজাসুজিই ওর দিকে তাকাচ্ছিলাম রিসেপশান কাউন্টারে দাঁড়িয়েই। ভুষুণ্ডার এত কাছে কাপেট-মোড়া হোটেলে দাঁড়িয়ে আছি, বিশ্বাসই হচ্ছিল না।

হঠাৎ একটি পরিচিত স্বর কানে এল আমার। অথচ, খুব-চেনা কারো স্বর নয়। লোকটা ভাঙা-ভাঙা ইংরিজিতে কথা বলতে বলতে কিউরিও-শপের সামনে দিয়ে আসছিল। এখুনি আমার সামনে বেরোবে এবং বেরুলেই তাকে দেখতে পাব। কোথায় যে তার কথা শুনেছি, মনে করতে পারছিলাম না।

লোকটি দেখতে দেখতে বেরিয়ে এল লবিতে, অন্য দুজন লোকের সঙ্গে কথা বলতে বলতে ; আর ঠিক সেই সময়ই তিতির নামল ট্যাক্সি থেকে।

আরে, ওয়ানাবেরি ! ওয়ানাবেরি ! আমি দেখলাম, তিতিরও ওয়ানাবেরিকে দেখেই চিনেছে, কিন্তু না-চেনার ভান করে গটগট করে স্মার্টলি ওর সামনে দিয়েই হেঁটে এল রিসেপশানের দিকে। তিতিরকে দেখে আমার মনে হল, মেয়ে মাত্রই খুব ভাল অ্যাকট্রেস হয়।

ওয়ানাবেরি তিতিরের হাঁটার ভঙ্গির দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে সঙ্গের দুজন লোককে কী যেন বলল সোয়াহিলিতে, চাপা গলায়।

ভুষুণ্ডাকে কিন্তু ওয়ানাবেরি আদৌ চেনে বলে মনে হল না। ভুষুণ্ডাও বোধহয় চেনে না।

সেখানে আর দাঁড়িয়ে থাকা আমার পক্ষে একটুও শোভন হচ্ছিল না। কাউন্টারে স্লিপ-প্যাড পড়ে ছিল। তাতে খসখস করে লিখলাম, বাংলায়, "চেক-ইন করেই নিজের ঘরে চলে যাও তাড়াতাড়ি। আমার ঘরের নাম্বার একশো তিন। একটুও বাহাদুরি কোরো না। এইসব জ্যান্ত মানুষরা কোনটোকির ছোট-ছোট টিনের বাক্স নয়।"

তারপরই আর একটি কাগজে লিখলাম ঋজুদার জন্যে, "বন্ধুরা হাজির। নতুন-পুরনো সব। তাড়াতাড়ি ঘরে যাও।"

লিখেই প্যাড-সুদ্ধ ঐখানেই রেখে তিতির কাউন্টারে পৌঁছতেই কাউন্টার ছেড়ে পেজ-এর সঙ্গে এলিভেটারের দিকে এগোলাম ; কিন্তু সেখানে গিয়ে পৌঁছুবার আগেই গুড়ুম করে একটি শব্দ হল। ফাঁকা জায়গায় শব্দ অন্যরকম শোনায়। শব্দটা প্রচণ্ড জোর মনে হল। ওয়ানাবেরির একজন সঙ্গী অন্যজনকে গুলি করেই কেউ কিছু করবার আগেই বাইরের দরজার দিকে জোরে দৌড়ে গেল। ঋজুদা ট্যাক্সি ছেড়ে দিয়ে সবে দরজা দিয়ে ঢুকছিল। আড়চোখে দেখলাম। লোকটার সঙ্গে ঋজুদার মুখোমুখি ধাক্কা লাগল আচমকাই। ধাক্কা লাগতেই, লোকটা সঙ্গে-সঙ্গে ঋজুদার বুকে পিস্তল ঠেকাল। ভেবেছিল বোধ হয় ঋজুদা ওকে আটকাতে চাইছে। আমার ধড়িটা থেমে গেল। ঘাড়ের কাছে ঠাণ্ডা লাগতে লাগল। দেখলাম, তিতিরের হাত কোমরের কাছে, আমার অজানিতে আমার হাতও কোমরে উঠে গেছিল।

কিন্তু, কিছুই হল না।

ওয়ানাবেরি সংক্ষিপ্ত স্বরে বলে উঠল, "বুই বুই ! নেণ্ডা জাকো। মারা মাজা।"

বলতেই, লোকটা এক ধাক্কায় সর্দার গুরিন্দারের সাদা দাড়িটা প্রায় উপড়ে দিয়েই ঝড়ের বেগে উধাও হয়ে গেল। দাড়ি উপড়ে গেলে যে কী ক্যালামিটি হত সে আর বলার নয় !

ভুষুণ্ডা তখন বুকে-গুলি-লাগা মাটিতে-পড়ে-যাওয়া মানুষটির দিকে চেয়ে প্যান্টের দু পকেটে দু হাত ঢুকিয়ে, কাঁধ শ্রাগ করে স্বগতোক্তি করল, "কুনা নিনি হাপা ?"

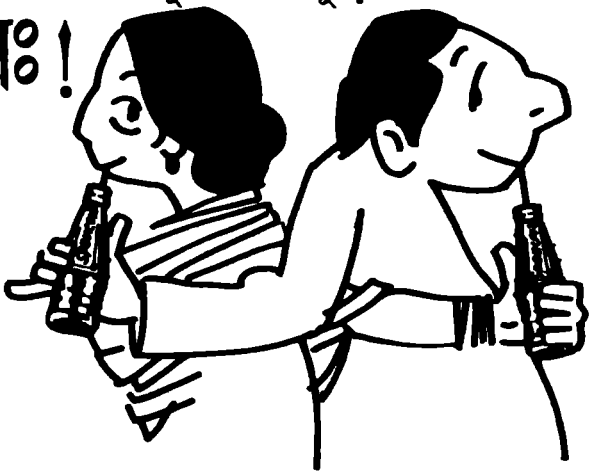

তাপে উত্তাপে সেরা সমাধান,
একবার মুখে দিলে জুড়োয় যে প্রাণ—
আঃ!
হ্যাঁ, এখন সেরা পানীয় বলতেই
Spencer's
আইসক্রীম সোডা
লেমোনেড
অরেঞ্জ * ভিটো
যেমন স্বাদ তেমনই তৃপ্তি— নেবার সময় এই ছাপ দেখে নেবেন
বিজলীগ্রীল স্পেন্সার্স প্রোডাক্টস

ওয়ানাবেরি জিরাফের মতো দুখানি লম্বা পা ফাঁক করে রক্তে ভেসে যাওয়া পুরু কার্পেটের মধ্যে দাঁড়িয়ে হোটেলের কর্মচারীদের চিৎকার-চেঁচামেচির মধ্যেই মাথা নেড়ে যেন কিছুই ঘটেনি এমনভাবে স্বগতোক্তি করল, "সিজুই, সিফাহামু।"

ঘরে ঢুকেই চায়ের অর্ডার দিলাম। এমন সময় ফোনটা বাজল।

তিতির ইংরিজিতে বলল, "হাই! মিস্টার অ্যালেন। হোয়াট আর ইওর প্ল্যানস্ ফর দ্যা ইভনিং? আই প্রেফার টু স্টে ব্যাক ইন মাই রুম। হাউ বাউট ইউ?"

আমি বুঝলাম যে, ঋজুদা নিশ্চয়ই ওকে ঘরেই থাকতে বলেছে।

বললাম, "আই অ্যাম ওলসো টায়ার্ড। ডোন্ট ফিল্ লাইক গোয়িং আউট।"

"ওকে দেন। গুড নাইট!"

"গুড নাইট।"

আবার ফোন বাজল। এবার ঋজুদা।

চাপা হাসির সঙ্গে বলল, "বোঝতাছেন কি কর্তা? নাটক দেহি জইম্যা গেল, আইতে না আইতেই? একতারাটারে এট্টু ঠিকঠাক রাইখ্যেন। কহন গান গাইতে অইব কওন যায় না। বোষ্টমীরেও এট্টু কইয়া দিয়েন, সময় বুইঝ্যা! বোজলেন?"

তারপরই বলল, "প্রেয়োজন অইলে আপনাগো ফোন করুম। দরজায় খিল লাগাইয়া ক্যাবিনেই বইস্যা থাহেন। বদর! বদর! আজ আর ছিন্-ছিনারি দেইখ্যা কাম লাই, লদীর গতিক ঠিক মনে অইতেছে না।"

আমি কী বললাম, তা বোঝার আগেই মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, "হ! হ! বেশি কওন লাগব না। বুঝছি!"

আসলে আমি তো বাঙালই। কিন্তু মা বিহারে মানুষ বলে বাঙাল ভাষা বলতে পারেন না। বাবা যদিও বলেন। এর জন্যেই বলে মাদার-টাং। থাকলে টাঙ্গি; না-থাকলে নেই।

(ক্রমশ)

ছবির মজা

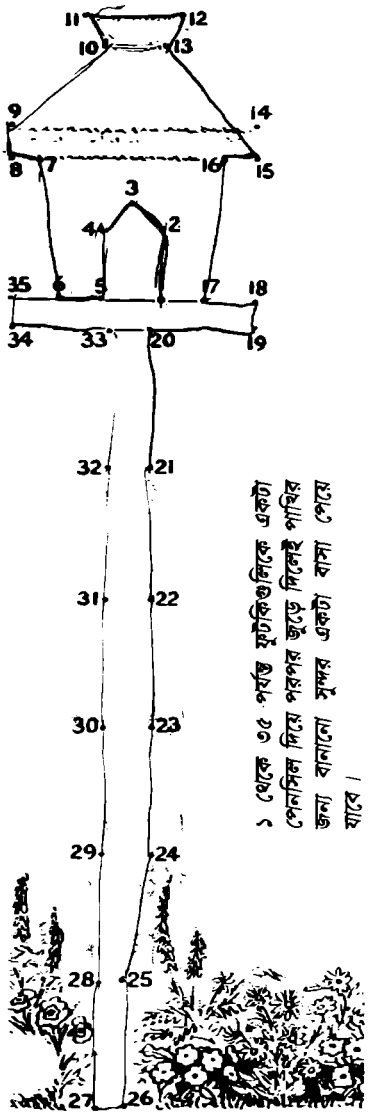

চুপচাপ ঘাপটি মেরে

বাচস্পতি

ভন্টু একটু অভিমান করল, "কাকু, তুমি হড়বড় করে একগাদা ক্রিয়াপদ আউড়ে গেলে, এত কি মনে থাকে ? মাথা কী রকম ঝিমঝিম করছে !"

বাবা বললেন, "তাছাড়া তোর লিস্টের অনেকগুলোই অবান্তর। ধর্ 'বেড়ানো' এই ক্রিয়াপদটা। এটার গোড়ায় যে[অ্যা] উচ্চারণ হবে— তা নিয়ে বাঙালদেরও কোনো ঝামেলা নেই। আমরাও বলি 'ব্যাড়ানো', 'বেড়ানো' বলি না। আসলে খুঁজে বার করতে হবে সেই সব 'এ' বা ে-কারকে, যারা আসলে ছদ্মবেশী 'অ্যা', চুপচাপ ঘাপটি মেরে বসে আছে। অন্যদিকে আমাদের বাঙালদের জন্যে একটা আলাদা রাস্তা দেখাতে হবে। বলতে হবে, দ্যাখো, অনেক জায়গায় এ/ে-কার দেখলে তোমাদের 'অ্যা' বলে ফেলার ঝোঁক হবে। সেখানে সেটা সামলে নিয়ে 'এ'-ই উচ্চারণ করতে হবে।" একটানা এতটা বলে ভন্টুর বাবা একটু লজ্জা পেলেন, বললেন, "যাচ্চলে ! কী রকম বক্তৃতা দিয়ে ফেললাম একটা।"

হিগিনকাকু চোখ বড়-বড় করে বললেন,

"পায়ের ধুলো দাও মেজদা, দারুণ বুঝিয়েছ সমস্যাটাকে !" বলে খুব উৎসাহ নিয়ে শুরু করলেন,"প্রথমে তাহলে ক্রিয়াপদগুলোকেই ধরি, কেমন ? ভন্টু, তোর বুড়িটা এগিয়ে ধর্। 'অ্যা'-ওয়ালা ক্রিয়াপদগুলোকে চেনবার একটা খুব সহজ উপায় আছে। সেগুলোর সাধারণ বর্তমানের রূপ 'অ্যা' দিয়ে। যেমন

সে খেলা দেখে [দ্যাখে]
সে খুব চেঁচায় [চ্যাঁচায়]
দিদি লুচি বেলে [ব্যালে]
লোকটা নেংচায় [ন্যাংচায়]

এই ক্রিয়াগুলোই আবার অনেক জায়গায় 'অ্যা'-কে ফেলে দিয়ে 'এ-কে ডেকে নেয়। অর্থাৎ যা গোড়ায় ছিল 'অ্যা', তাই হয়ে যায় 'এ'। যেমন

সে খেলা দেখে খুশি হয়নি
সে চেঁচিয়ে পাড়া মাত করল
দিদি লুচি বেলে রেখে ঘুমোতে গেল
লোকটা নেংচে-নেংচে দৌড়োচ্ছে।

কাজেই কোন্ ক্রিয়ার গোড়ায় 'অ্যা' আছে তা নির্ভুল জানতে হলে লক্ষ করো তার বেলায় ঐ ওপরের জায়গাতে 'এ' হচ্ছে কি না। হলেই বুঝবে, ইনি আসলে ঘাপটি 'অ্যা'। 'বেচা'-তে যে 'অ্যা' আছে আমরা বাঙালরা তো খুব কমই জানি।"

ভন্টু বলল, "আর যেখানে সত্যি-সত্যি 'এ' আছে ?"

হিগিনকাকু বললেন, "বেঁচে থাকো। সেখানে ঐ ওপরের জায়গায় 'এ' হয়ে যায় 'ই'। যেমন কেনা, লেখানো, মেশানো, ঘেরা ইত্যাদির বেলায় ;

সে বইটা কিনে খুশি হয়নি
সে দাদাকে দিয়ে দরখাস্ত লিখিয়ে নিলে
দিদি দুধে কফি মিশিয়ে খাচ্ছে
চারটে ডাকাত আমাকে ঘিরে ধরল।

অর্থাৎ 'এ'-ওয়ালা ক্রিয়াপদ যেখানে 'ই' উচ্চারণ পাচ্ছে, ঠিক সেই জায়গায় 'অ্যা'-ওয়ালা ক্রিয়াপদ পাচ্ছে 'এ' উচ্চারণ। দুয়ের এই তফাতটা খেয়াল রাখো।" (ক্রমশ)

শিশিরকুমার বসু

(৫৯)

লাহোর ফোর্টের বারো নম্বর সেল আমার জন্য ধার্য ছিল। রেড ফোর্টের মাটির তলার ঘরটির চেয়ে অনেক ছোট, বড়জোর দশ ফিট × বারো ফিট হবে। মেজেটা ইট বের করা, কেবলই হোঁচট খাবার ভয়। দুদিকের দেওয়ালের একই অবস্থা, তবে চুন মারা আছে। উত্তর-পূর্ব দিকটা সম্পূর্ণ খোলা, অবশ্যই মোটা গরাদ দেওয়া। গেটটাও বেশ বড় এবং এমন ভাবে বাইরে থেকে বন্ধ করা যে কারুর সাধ্যি নেই যে সেটাকে একটু নাড়াতে পারে। ঐ দুই দিক দিয়ে বাইরে থেকে বন্দীর উপর বেশ ভাল নজর রাখা যায়। আসবাবের মধ্যে একটা ছোট মাপের চারপাই বা খাটিয়া, যাতে পা ছড়িয়ে শোয়া সম্ভব নয়। আর আছে—একটা জলের কলসি আর একটি আধ-ভাঙা পিতলের গেলাস। ঘরের এক কোণে অতি প্রাচীন কায়দায় পায়খানার ব্যবস্থা। বুঝলাম বাবার মনে যে আশঙ্কা ১৯৪২ সাল থেকে জেগেছিল তাই শেষপর্যন্ত হয়েছে। কুখ্যাত এই বন্দীশালায় আমাকে এনে ফেলেছে।

ভাবতে লাগলাম আমাকে নিয়ে এরা কী করবে। যে নাটকীয় ভাবে এরা আমাকে লাহোর দুর্গে এনে ফেলল, নিশ্চয়ই ব্যাপারটা অনেক দূর গড়িয়েছে, এবং খুবই গুরুতর কিছু ঘটতে যাচ্ছে, আমি বুঝতে পারছিলাম। এরা সম্ভবত আমাদের দলের অনেককেই ধরে ফেলেছে। আমার মনে হয়েছিল এরা খুব সম্ভব লুকিয়ে আমাদের বিচার করবে এবং কঠোর সাজা দেবে। কম করে হলেও যাবজ্জীবন কারাদণ্ড তো হবেই, কারুর-কারুর ফাঁসিও হতে পারে। বিচারের সময় আসামির কাঠগড়ায় কাকে-কাকে দেখব আন্দাজ করার চেষ্টা করলাম। যদি আসামি হয়েই জীবনের শেষ কথা বলতে হয়, তাহলে কী বলব তাও মনে মনে বিচার করতে লাগলাম।

বারো নম্বর সেলে তালা বন্ধ হবার কিছুক্ষণ পরেই আমাকে প্রথম সম্ভাষণ জানাল একটি কালো বিড়াল। একটি বড় ছাদ আমার সেল থেকে দেখা যেত, তার ধারে এসে স্থির হয়ে বসে বিড়ালটি আমার দিকে চেয়ে রইল। কালো বিড়াল তো আমরা মোটেই শুভ বলে মনে করি না, ইংরেজরা কিন্তু করে। নিজেকে বোঝালাম, ইংরেজেরই তো এখন রাজত্ব, সুতরাং তাদের সংস্কারমতো কালো বিড়ালটিকে শুভ বলে ধরে নেওয়া যাক। একটু পরেই একটি সুশ্রী হরিণ এসে গরাদের বড় জানলা দিয়ে আমাকে দেখতে লাগল। একটু হাসিই পেল, কেমন যেন চিড়িয়াখানার উলট-পুরাণ। আমি রয়েছি খাঁচার মধ্যে, বাইরে থেকে জন্তু-জানোয়ার আমাকে দেখছে। হরিণটি লাহোর ফোর্টে আমার সাড়ে তিন মাস নিঃসঙ্গ বন্দিদশার সময় প্রায়ই আমার সেলের সামনে ঘোরাঘুরি করত, আমার ভালই লাগত। বন্দুকধারী সান্ত্রি তো রয়েছেই। সে আমার সেলের সামনে পুরোপুরি মিলিটারি কায়দায় পায়চারি করে। রাইট অ্যাবাউট টার্নগুলির প্রত্যেকটি পদ আমি খুঁটিয়ে দেখতাম। যখন দেখলাম কেউই এদিকে মাড়াবে না বলে মনে হচ্ছে, সিপাইয়ের সঙ্গে আলাপ

জমানোর চেষ্টা করলাম। জবাব শুনে তো আমার চক্ষু চড়কগাছ। কেবল বলল, "বাত্ করনা মনা হ্যায়।" সাড়ে তিন মাস সে আমার সঙ্গে আর একটি কথাও বলেনি। কেউ তো কোথাও নেই, কিন্তু সান্ত্রিমশাই নিজের চেহারা-ছবি, পোশাক, বন্দুক সম্বন্ধে খুব সজাগ। তার প্যান্টের দু'পকেটে দুটি রুমাল। একটি দিয়ে মুখ মোছে, আর একটি দিয়ে জুতোজোড়া পালিশ করে। ভাবতাম, মাঝে-মাঝে নিশ্চয়ই উলটো-পালটা হয়ে যায়!

রাতগুলো ছিল বড়ই বিভীষিকাময়। আমার সেলের ছাদ থেকে একটা জোরালো আলো আমার উপর সবসময় ফোকাস করা আছে। বাইরেটা একেবারে অন্ধকার। সব সময়েই মনে হচ্ছে ওরা আমার প্রতিটি ওঠা-বসা ঘোরা-ফেরা বাইরে থেকে দেখছে, আমি কিন্তু কাউকেই বা কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। মাঝে-মাঝে পায়ের শব্দ কাছে আসছে মনে হয় আর সান্ত্রিমশাই হুঙ্কার দিয়ে ওঠেন 'হুল্ট্!' কিছু একটা বলে আগন্তুক সরে যায়, পায়ের শব্দও ধীরে ধীরে মিলিয়ে যায়। ঐ অবস্থায় কি ঘুমানো যায় নাকি!

আমি যখন লাহোর ফোর্টে দিন গুনতে আরম্ভ করেছি বাড়িতে তখন তোলপাড়। সরকার কিছুতেই জানতে দেবে না আমি কোথায় কী অবস্থায় আছি। বাবাই বোধহয় কেবল বুঝতে পেরেছিলেন আমাকে কোথায় নিয়ে গেছে, তাঁর দক্ষিণ ভারতের বন্দিশালা থেকে লেখা চিঠিপত্র থেকে এটা বোঝা যায়। মা'র তো করুণ অবস্থা। তাঁর একটা চিঠির জবাবে দিল্লি থেকে হোম ডিপার্টমেন্ট সোজা বলে দিল যে আমি কোথায় বন্দী তারা বলবে না, দেখা করতে দেবে না। তবে আমার জন্য জিনিসপত্র পাঠাতে চাইলে দিল্লিতে পাঠিয়ে দিতে পারেন। দৈনন্দিন ব্যবহারের জন্য কাপড়-চোপড় ও অন্যান্য জিনিসপত্র বাড়ি থেকে পাঠানো হয়েছিল, কিন্তু আমাকে কিছুই দেওয়া হয়নি। আমি সাড়ে তিন মাস এক কাপড়ে ছিলাম, স্নানও করিনি, দাঁত মাজিনি, দাড়ি কামাইনি।

দিনের পর দিন চলে যাচ্ছে, কেউ আমাকে দেখতেও আসে না। বাইরে থেকে ভিস্তি কলসিতে জল দিয়ে যায়, আর একজন বাইরে থেকে গরাদের নীচে দিয়ে খাবারের থালা ঠেলে দিয়ে যায়, যেমন চিড়িয়াখানায় জানোয়ারদের দেয়। কিন্তু সকলের মুখে কুলুপ আঁটা। সকালের খাবার ইঁটের মতো শক্ত একটা রুটি আর চা। ভাঙা গেলাসে বাইরে থেকে চা ঢেলে দেয়, সামান্য মিষ্টি দেওয়া উষ্ণ জল বই আর কিছু নয়। খাবারের কথা না বলাই ভাল। ঠাণ্ডায় জমা খাদ্য, কোনোরকমে উদরস্থ করা আর কী!

দিনকতক কাটবার পরে মনে হল দিনক্ষণ ঠিক রাখতে পারছি না। দেওয়ালের এক কোণে নখ দিয়ে দাগ কাটা আরম্ভ করলাম, রোজ একটা করে দাগ, মানে তারিখের হিসেব।

হঠাৎ একদিন সকালে বেশ ফিটফাট সাহেবি পোশাক-পরা এক অফিসার আর কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে আমার সেলের সামনে এসে হাজির। যেন কিছুই জানেন না এমন ভান করে- কেতাদুরস্ত ইংরেজিতে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি এখানে এসেছেন কেন, হোয়াই হ্যাভ ইউ কাম্ হিয়ার?

আমি বললাম, আমি নিজের ইচ্ছায় আসিনি, আমাকে এখানে নিয়ে আসা হয়েছে। তিনি বললেন, ঐ একই কথা হল। আরও বললেন, আপনাকেও শিক্ষিত ভদ্রলোক বলে মনে হচ্ছে, আপনি আবার গোপনে বিদ্রোহাত্মক কাজকর্ম করছিলেন নাকি! এটা তো ভদ্রলোকের জায়গা নয়, এখানে কেবল খুব মারাত্মক চরিত্রের লোকেদের নিয়ে আসা হয়। যাঁরা অহিংস সত্যাগ্রহ আন্দোলন করেন, তাঁদের সাধারণ জেলে বা ডিটেনশন্ ক্যাম্পে পাঠানো হয়,

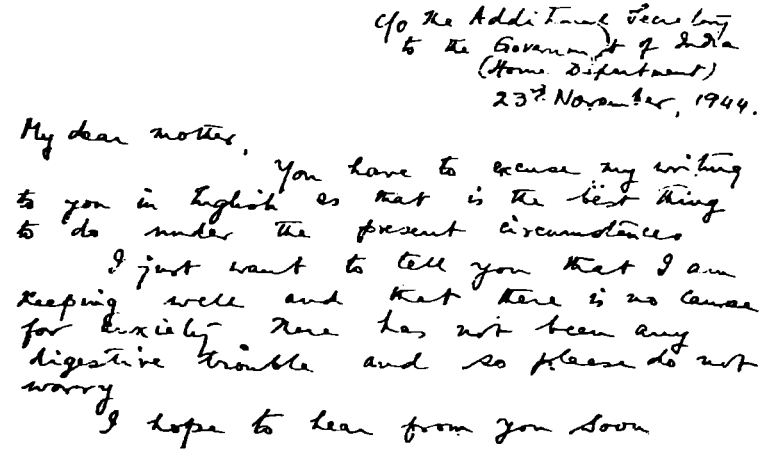
c/o The Additional Secretary
to the Government of India
(Home Department)
23rd November, 1944.

My dear mother,

You have to excuse my writing to you in English as that is the best thing to do under the present circumstances.

I just want to tell you that I am keeping well and that there is no cause for anxiety. There has not been any digestive trouble and so please do not worry.

I hope to hear from you soon

লাহোর ফোর্ট থেকে লেখা লেখকের প্রথম চিঠি

দল বেঁধে তাঁরা বেশ থাকেন। লাহোর ফোর্ট এক ভয়ঙ্কর জায়গা, এখানে একবার যে এল, সারা জগৎ তাকে ভুলে যায়, আর একবার এখানে এলে এখান থেকে বেরোবার ঠিক-ঠিকানা নেই। এক যুগ কেটে যেতে পারে।

এই সব কথা বলে আবার ভাল করে আমি কী করি, কোথা থেকে এসেছি ইত্যাদি জিজ্ঞেস করলেন। আমি বাংলাদেশ থেকে এসেছি শুনে বললেন, তোমার ইংরেজিটা তো অন্যরকম, কোথা থেকে শিখেছ? বাংলা থেকে যে-সব লোক এখানে আসেন, তাঁদের মধ্যে এম. এ. এম. এসসি. পাশ করা লোকও আছে, কিন্তু তাঁদের ইংরেজি উচ্চারণ তো অন্যরকম।

আমি বললাম, আপনি কিছুই জানেন না, অনেক-অনেক বাঙালি আছেন যাঁরা আপনার চেয়ে ও আমার চেয়ে অনেক ভাল ইংরেজি বলেন। আমি যেটুকু বলি সেটুকু আমি আমার বাবার কাছে শিখেছি। শেষ পর্যন্ত তিনি বললেন, 'গুড লাক্' ছাড়া তাঁর আর কিছু বলার নেই। পরে জানলাম অফিসারটির নাম নাজির আহ্‌মদ্ রজ্‌ভি, লাহোর ফোর্টের ভারপ্রাপ্ত স্পেশাল সুপারিন্‌টেনডেন্ট অব পুলিশ।

মাস-দুয়েক আমার খবর না পেয়ে মা'র মনে হয়েছিল যে, আমি সম্ভবত বেঁচে নেই। খবরটা সরকার চেপে যাচ্ছে। আক্ষেপের সুরে ভাই-বোনেদের কাছে বলতেন, সত্যি কথাটা বলে দিলেই তো পারে। নভেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে আমাকে বলা হল যে, আমি বাড়িতে একটা পোস্টকার্ড লিখতে পারি, তবে ইংরেজিতে লিখতে হবে। পোস্টকার্ড একটি লোক নিয়ে এল, সঙ্গে কালি ও কলম, তার সামনে লিখতে হবে। আমি তো লাহোর ফোর্টের ঠিকানা দিয়ে মাকে দু-চার লাইন লিখলাম। দুদিন পরে আমাকে বলা হল, লাহোর ফোর্টের ঠিকানা দেওয়া চলবে না। ভারত সরকারের অ্যাডিশনাল হোম সেক্রেটারির কেয়ারে আমি আছি, ঐ-টুকুই লেখা যাবে। তাই লিখলাম। চিঠিটা মা'র হাতে পৌঁছেছিল, কিন্তু তাঁর চিন্তা দূর করতে পারেনি। (ক্রমশ)

সহজে ইংরেজি

রাস্তায় জল

প্রসাদ

চামেলিদের বাড়ির সামনের রাস্তা দিয়ে এমনিতে বাস-টাস চলে না, সেদিন দুপুরে হঠাৎ জোর বৃষ্টি হয়ে বড় রাস্তায় এক-কোমর জল জমে গেল। আর মিলি ইস্কুল থেকে ফিরে এসে দেখল যত লোক-বোঝাই বাস ঠিক তাদের বাড়ির সামনে দিয়েই যাচ্ছে, মহা শোরগোল তুলে। দেখে ভারী মজা লাগল মিলির। তাড়াতাড়ি জামা বদলে, হাত-মুখ ধুয়ে একটু খেয়ে নিয়ে মিলি বারান্দায় এসে দাঁড়াল।

Milly was thrilled.

The quiet little street in which she lived looked so different that afternoon.

Buses, filled with passengers, were splashing along the flooded street.

Many people were wading through the water.

Milly thought it odd that so many people should be out in that kind of weather.

Then she told herself, "Perhaps they have come out because they had to. Many of them must be returning from work."

"They don't at all look as if they are having a good time," Milly thought.

She had always thought it strange that people should dislike water so much.

মা এসে বারান্দায় দাঁড়ালেন। চম্বল এখনও ইস্কুল থেকে বাড়ি আসেনি, বাবাও ফেরেননি। বৃষ্টি থেমে গেছে, কিন্তু রাস্তায় এখনও জল।

Mummy didn't say anything, but she looked worried.

She craned her neck to see if there were any signs of Chambal and

Daddy.

Milly became worried, too.

She began to consider it unlucky that there was so much water on this street just then.

"It's because of this Daddy and Chambal aren't back home," she thought. She thought there must be many others unable to come home because the streets were flooded.

"I hadn't thought of them," Milly said to herself.

She now thought it wrong of her not to have done so.

এমন সময়ে বাবার গাড়ি বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল, আর চম্বলকে এবং তার সঙ্গে আরও তিনজন অচেনা লোককে দেখা গেল সেই গাড়ি থেকেই বেরোতে। আসলে, গাড়ি কোথায় যেন জলে আটকে গিয়েছিল। চম্বল তখন জলের মধ্যে দিয়ে ছপ্‌ছপ করে বাড়ি আসছিল। সে এবং ওই তিন জন রাস্তার লোক মিলে গাড়িটাকে অনেক দূর ঠেলে নিয়ে এল, তবে গাড়িটা আবার স্টার্ট নিল।

Daddy thought it right to bring those friends home for a cup of tea.

লক্ষ করো

Milly thought it odd that so many people should be out that afternoon.

She thought it strange that people should dislike water

She considered it unlucky that there was so much water on the streets.

She thought it wrong of her not to have done so.

Daddy thought it right to bring them home.

টারজান
এডগার রাইস বারোজ
ওরে বাবা, সাপের কবল থেকে বেঁচে এখন গোলার ঘায়ে মরতে হবে !
ঘাবড়ে না-গিয়ে বরং টারজানের কথা মেনে চলুন, মিঃ ব্রিংক !
অকারণে গোলাগুলি খর্চা করছে কেন ? মটালার মতলবটা আসলে কী ?
একটু বাদেই মতলবটা বোঝা গেল.
কুমির ! গোলার শব্দে ভয় পেয়ে জলা থেকে উঠে আসছে !
টারজান, এবার তোমার জন্য আমরা কুমিরের পেটে যাব !
মিঃ ব্রিংক, আপনি তখন না-পালালে আমরা এতক্ষণে নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে যেতুম !
চ্যাঙ্গো ! আশান্দ্রা ! ব্রিংক ! এই ঘাস ছিঁড়ে আঁটি বেঁধে মশাল জ্বালো !
এবং...
কাজ হয়েছে ! কিন্তু এইভাবে কতক্ষণ বাঁচব ?
শুনতে পাচ্ছ টারজান ?

ভেরোনা—আপনার কষ্টার্জ্জিত টাকা
বাঁচাবার লাভজনক পরিকল্পনা করছে।

ভেরোনা—ভবিষ্যৎ উজ্জ্বলের প্রতীক, সুখ ও সমৃদ্ধির নিশ্চয়তা আনে এবং
উদ্যমশীল যুবকদিগকে কর্ম্মের সংস্থান দেয়।

ভেরোনা কমার্শিয়াল ক্রেডিট এণ্ড ইনভেষ্টমেণ্ট কোং লিঃ

রেজি: অফিস: দুর্গাচক ৭২১৬০২ হলদিয়া: মেদিনীপুর ফোন: ডি সি কে-৩২
হেড অফিস: ৭১/১এ, পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা-৭০০০০৯ ফোন: ৩৪-২৩৩৬

ভেরোনা—আপনার অর্থের পূর্ণ নিশ্চয়তা গ্রহণ করছে

রিকান/ভেরোনা-৮২

আঁকো

ডিম থেকে মাথা

বারবার নানান ভাবে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে তোমাদের দেখাবার চেষ্টা করছি কত সহজে কেমন ভাবে ভাববে, আর সেই ভাবনাকে কাগজে ফেলবে। একটু নমুনায় নজর দিলেই বিষয়টা আরও সোজা হবে। কেমন ভাবে পাশফেরা মাথা নিচু হচ্ছে দ্যাখো।

রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

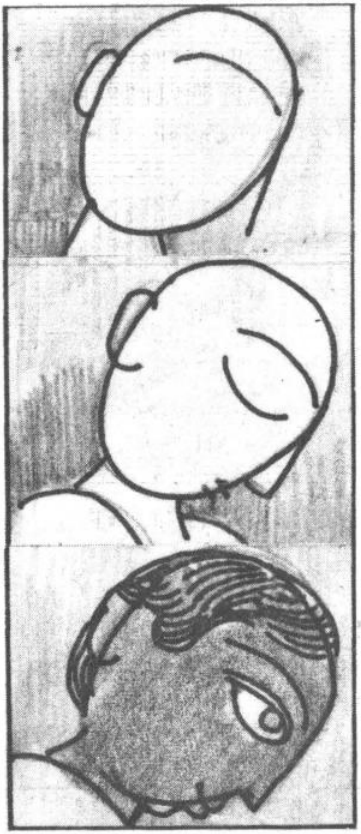

শেখো

মুখোশ-১

নাটক এবং নানারকম মজা করতে মুখোশ লাগে। এ-জিনিস নিজেরাই বানিয়ে নিতে পারো। নকশা-মাফিক আর যে-আকার চাও সেই মাপমতো পাতলা বোর্ড নিয়ে তার ওপর সম্পূর্ণ এঁকে নিয়ে কাগজকে ঠিক মাঝামাঝি ভাঁজ করে নাও। ভাঁজ হয়ে গেলে (২ নং চিত্র) ভেতরের আকার ছাড়া যে বাড়তি কাগজ থাকবে তা সমান ভাবে কেটে বাদ দিলেই তোমার আকার পাবে।

জেনে রাখো—(ক) ভাঁজ করে কাটার সময় যেন সুন্দর ভাবে চেপে ধরা হয়। একটু নড়চড় হয়ে গেলে দুপাশের আকার আলাদা হয়ে যাবে, আর তা দেখতেও লাগবে অদ্ভুত। পরিষ্কার ভাবে কাজ না করলে মুখোশ সুন্দর হবে না।

এ-কাজের জন্য দরকার—বোর্ড, রঙিন কাগজ, আঠা, সামান্য দড়ি, সুতো, তার, আঁকার জন্য ব্রাশ। আর চাই পছন্দমতো রঙ।

কারিগর

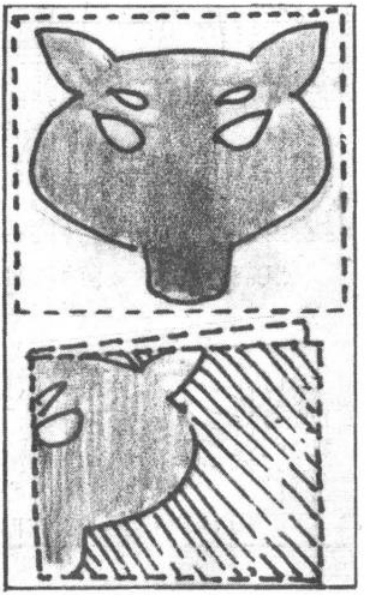

ও, তার ছিঁড়ে এই বিপত্তি ? এখুনি মেরামত করে দিচ্ছি !
রকেট এবারে কথা শুনবে।
আরে, আমি ভেবেছিলাম আমারই চুল ছিঁড়ছি !
অবজারভেটারি টু কনট্রোল রুম . . রকেট ধ্বংস হয়ে গেছে !
রকেট ওরা ধ্বংস করে দিয়েছে ! আমাদের মতলব হাসিল হল না !
কাগজপত্র চুরি হওয়ায় আমার সন্দেহ হয়েছিল, শত্রুপক্ষ আমাদের রকেট হাতাতে চায়। প্রোফেসরকে সে-কথা বলতে উনি এমন একটা ব্যবস্থা করেন, যাতে দরকার হলেই রকেটটা আমরা ধ্বংস করতে পারি।
কিন্তু আমার সমস্ত পরিশ্রমই যে ব্যর্থ হল !
ঠিক কথা !
না, প্রোফেসর, কিচ্ছু ব্যর্থ হয়নি। পরমাণু-মোটর ঠিকমতো কাজ করেছে, রকেটও চন্দ্র-পরিক্রমা করেছে, তাই না ?
টিনটিনের কথাই ঠিক। কালই আমরা নতুন রকেটের কাজে হাত দেব। আর তাতে উঠেই আপনি চাঁদে যাবেন।
চাঁদে ! হুররে !
দু'সপ্তাহ বাদে . . .
দূর, দূর, কিচ্ছু করবার নেই !
বেকার বসে আছি এখানে ! কেন যে এলুম ! আর ওই ক্যালকুলাসটাই হচ্ছে নষ্টের গোড়া !
ওহে প্রোফেসর, আর কতদিন এইভাবে বসে থাকব !
বলি, কবে আমরা চাঁদে যাচ্ছি ?
সত্যি ?··তুমিও ?··আশ্চর্য !
আমার অবশ্য বাঁ কাঁধে ব্যথা। তোমার তো ডান কাঁধে ? সেরে যাবে।
সুপ্রভাত, মিঃ ব্যাক্সটার।
সুপ্রভাত। ওটা কী ? রকেটের ব্লু-প্রিন্ট ?
না, না, এটা আমাদের রকেটের ব্লু-প্রিন্ট। এই দেখুন।

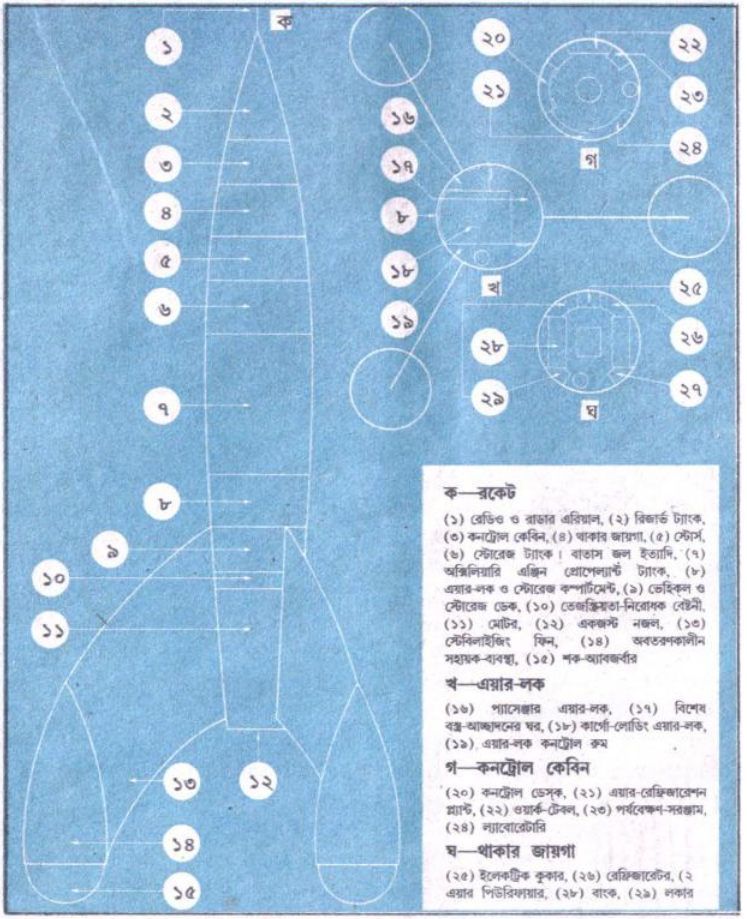

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

শালিখের মালিক

তপন সরকার

টিকলি ভাবে, তপনদাকে আর কীভাবে বোঝানো যায়! মা, জেঠিমা এমনকী বড়দিকেও দেখেছে টিকলি, কোথাও একটা শালিখ দেখলেই এদিক-ওদিক তাকিয়ে আর একটাকে খুঁজবেই। আচ্ছা, জেঠিমা না-হয় এটা করতে নেই, ওটা খেতে নেই, আজ এই ষষ্ঠী, কাল সেই—এইসব নিয়ে খুঁতখুঁত করেন, কিন্তু বড়দি তো কত পড়াশুনো করেছে! তপনদাটার বেশি-বেশি! সেদিন পড়ার ঘরের জানালা দিয়ে দুটো শালিখ দেখে টিকলি কপালে আলগোছে হাত ঠেকিয়েছে কি ঠেকায়নি, ব্যস শুরু হয়ে গেল বুকনি। এসব মনের দুর্বলতা। মনখারাপের সঙ্গে শালিখের কোনো সম্পর্কই নেই। এক শালিখ না দেখলে কি মনখারাপ হয় না নাকি?

তা হয়! কিন্তু এক শালিখ দেখলে হবেই। কতদিন থেকে দেখে আসছে। এই তো সেবার ববিদার বিয়ের সময় বাসে করে বরযাত্রী হয়ে টাটানগর ওর যাওয়া প্রায় ঠিকঠাক। ভেবে রেখেছে নতুন লাল ফ্রকটা সেদিনই পরবে। সকালবেলায় মুখ ধুতে গিয়ে টিকলি দেখে পাঁচিলের ওপর নাচছে একটা শালিখ। সব ঠিকঠাক, অথচ বাবা হঠাৎ বললেন, 'টিকলির সামনে পরীক্ষা, ওর যাওয়ার দরকার নেই—বাড়িতে থেকে পড়বে।' কই, এতদিন তো তোমরা বলনি! কী মনখারাপ কী মনখারাপ!

শেষে শালিখ দেখতে-দেখতে এমন হল যে, পড়ার ঘরের বাইরে কিচিরমিচির শুনেই টিকলি বলতে পারত, একলা শালিখ না দোকলা। সাধারণত সকালে-বিকেলে ঘরে ফেরার সময় ওরা জোড়া-জোড়াই থাকে। দুপুর বেলাতেই ওদের দেখা যায় একা-একা মাঠে ঘুরতে। কখনও আবার একটা শালিখকে ঢিল ছুঁড়ে উড়িয়ে দিলে ওটা ঠিক খুঁজে ওর জোড়াটার কাছে বসবে। সেটা ভারী মজার! শালিখরা আবার অনেক সময় ঝাঁক বেঁধে থাকে। তবে ওরা উঁচু গাছে বেশি বসে না। খুব বেশি ঝোপঝাড়ে থাকে না। খোলা মাঠই ওদের পছন্দ। সারাক্ষণ খুটুর-খুটুর করছে, এদিক-ওদিক চাইছে আর কতরকম সুরে ডাকছে। হলে হবে কী, শালিখ কিন্তু বেশ ঝগড়াটে পাখি। কাকেদের সঙ্গেই ওদের বেশি ঝগড়া। ঝগড়ার সময় ওদের ডাকও পালটে যায়। এত পরিষ্কার সুর কিন্তু অন্য পাখি পালটায় না। এজন্যেই কি অনেকে শালিখ পোষে? শালিখ সম্বন্ধে জ্ঞান বাড়তে থাকে টিকলির। মাঝে-মাঝে ভাবে, তপনদাকে এইসব বলবে। যা গম্ভীর মুখ করে পড়ায়! নিশ্চয়ই খুব দুঃখ। কেন, রোজ সকালে একটু খুঁজেপেতে দুটো শালিখ দেখলেই হয়।

হাফইয়ার্লি পরীক্ষার পর প্রায়ই খেলে ফিরতে দেরি হচ্ছে টিকলির। সন্ধে হয়ে গেল পর-পর ক'দিন। মা বকে। গ্রামের মাঠে খেলা সেরে যখন ফেরে চারদিক আবছা হয়ে আসে। বাঁধের বাঁকে ঝাপসা দেখায় একটা-দুটো নৌকো। নদীর জল কালি-কালি লাগে। চুপচাপ চারদিক। কেবল ভাঙা রিকশায় মাইক আর বড় বড় ছবি লাগিয়ে সিনেমার লোকরা ফেরে।

সেদিনও দেরি হয়েছে ফিরতে। মা আজ আর আস্ত রাখবে না। ভয়ে-ভয়ে তিরতির করে ফিরছে টিকলি। বাবা এসে যাবেন। তবে অন্যদিনের মতো মা যদি এতক্ষণে পাঠ শুনতে চলে গিয়ে থাকে, তাহলে জানতে পারবে না। 'ঠাকুর ঠাকুর, তাই যেন হয়।' বলতে বলতেই টিকলি দেখে, বাঁধের নীচে তিড়িক তিড়িক করে নাচছে একদম একলা একটা শালিখ। ভীষণ রাগে, অভিমানে চোখে জল এসে

যায় টিকলির। তারপর কী ভেবেছে জানে না, একটা ঢিল তুলে দারুণ জোরে ছুঁড়ে মেরেছে টিকলি।

ব্যস, আমাদের গল্প এখানেই শেষ। যা হবার নয় তাই হল। যে-মেয়ে এই সেদিন দুধের ছোট ডেকচি নামাতে গিয়ে উল্টে ফেলেছে, একা টিপ পরলে যে-মেয়ে ব্যাঁকা পরবেই, সে শালিখটাকে এমন করে ঘায়েল করল কী করে ? টিকলির বিশ্বাস হতে চায় না। পায়ে-পায়ে এগিয়ে দেখে উড়তে পারছে না শালিখটা। ইটের ঘায়ে থেঁতলে গেছে একটা পা। রক্ত পড়ছে নাকি ? কোথা থেকে এল এটা ? এ যে একদম বাচ্ছা !

তার পরের দৃশ্য বাড়িতে। টিকলির ডাক্তার-বাবা গম্ভীর মুখ করে বাড়িতে ঢুকে দেখেন—তাঁর ছোট মেয়ে উশকোখুশকো চুলে, হাঁটু পর্যন্ত ধুলোমাখা পায়ে, কান্না-কান্না মুখে, জলভরা চোখে আর রক্তমাখা এক শালিখ দু হাতে বুকে করে অন্ধকারে উঠোনের এক কোণে দাঁড়িয়ে আছে।

"ফেলে দাও, ফেলো ওটা। কোত্থেকে একটা আধমরা, নোংরা পাখি নিয়ে এসেছে।"

ততক্ষণে মা, জেঠিমা, অভিরাম, ফুটি, তপনদা সবাই এসে দাঁড়িয়েছে।

"ফ্যাল্ বলছি। কোত্থেকে পেল ?"

"বেড়ালে খাওয়া নাকি ?"

"ইস্, নতুন ফ্রকটাতে পর্যন্ত রক্ত লাগিয়েছে। ফেলে দে বলছি।"

এইরকম সব বাক্যবাণের সামনে দাঁড়িয়ে চোখভরা জল নিয়ে টিকলি বলে, "না।"

তারপর ডাক্তারি-পড়া দাদা লেনিন এল। পাখি আর পাখির মালিকের জন্য গরম জল চাপল রান্নাঘরে। এমনকী ওষুধ ব্যাণ্ডেজ মাখা পাখি সিঁড়ির পাশের পেঁয়াজ রাখা ঘরে কিছুদিন চুপচাপ থেকে কিচিরকিচিরও শুরু করল।

অভিরাম একটা বাঁশের খাঁচা এনে

দিয়েছে। সকালে উঠেই টিকলির কাজ এখন একদৌড়ে খাঁচাবন্দী সেই এক-শালিখকে দেখে আসা। তারপর সারাদিন তার কত আদরযত্ন। কাছাকাছি কেউ না থাকলে কত গল্প। স্কুলে গিয়েও মনখারাপ হয়। মন বসে না ঠিক—পাখিটা খেল তো ?

আজকাল বরং টিকলির দু' শালিখ দেখলেই মনখারাপ হয়। ইস্, আর একটা যদি একদম একলা-শালিখ পাওয়া যেত ! তবে টিকলি এটাকে উড়িয়ে দিয়ে বলত, যা, জোট বাঁধ।

ছবি সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

সোনারপুকুর

শুক্লা বন্দ্যোপাধ্যায়

গ্রামের নাম ঝুমুরগঞ্জ। অনেকে আবার ঝুমুরগঞ্জও বলে। শিপু তাদের এই গ্রামটির নামের কথা ভাবলেই একটু অবাক হয়।

শিপুর দাদা বলে, "অবাক হওয়ার তো কিছু নেই, একসময় এখানে নিশ্চয়ই নাচগান হত।" মা বলেন, "ঠিক কথা, ঝুমুর তো গানের নাম, ছোটবেলায় আমরা দেখেছি।"

শিপু ভাবে, মায়েদের ছোটবেলাটা বেশ মজার ছিল। কত কী-ই তো ছিল তখন। রাস্তায় নাকি হাতিঘোড়া সার বেঁধে যখন-তখন বেড়াত, যুদ্ধ-যুদ্ধ খেলা হত। রাজা, রানী, সেনাপতি—সব নাকি ছিল তখন। মা নিজের চোখে রাজপুত্র-রাজকন্যা দেখেছেন। মাথায় তাদের সোনার মুকুট, দুধে-আলতা গায়ের রঙ, তারা নাকি হাসিমুখে মায়েদের দিকে তাকিয়েছিল!

শুধু তাই? মায়েদের পাড়ার ঈশানকাকা কখনও মা-দুর্গা সেজে কখনও খাঁড়া হাতে জিভ বার করে মা-কালী হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন। ঠিক যেন মা-কালী।

সে এমন সাজ যে, কেউ বুঝবেই না ঠাকুর না মানুষ।

শিপুরা এসব কিছুই দেখতে পায় না। মা বলেন, "যুদ্ধের সময় সব হাতি-ঘোড়া মারা গেছে। এখন তাই হাতি-ঘোড়া দেখতে গেলে কলকাতা ছুটতে হবে, আলিপুরের চিড়িয়াখানায়। কিন্তু মানুষ তো অনেক বেশি এখন। তাদের কেউ মায়ের ঈশানকাকার মতো দুর্গা, কালী সাজে না কেন?

শিপুর দাদা সোমেন ক্লাস এইটে পড়ে। শিপুর তো ক্লাস ফোর, সে তো অনেক কম জানবেই। তাই বোনকে বোঝায়, "কী লাভ শুধু-শুধু অতক্ষণ জিভ বার করে থেকে? কেউ তো একটা পয়সাও দেবে না।"

মা হেসে বলেছিল, "শুধু পয়সা পাবার জন্যেই নয় রে, কেউ-কেউ ও-রকম মজাদার মানুষ হয়।" শিপু দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে

ভাবে, মজা করার মতো একটা মানুষও কি তাদের গ্রামে থাকতে নেই !

শিপুর কিছুই ভাল লাগছে না। তেঁতুল-আমচুর-আচারে পর্যন্ত রুচি নেই। মন-টন খারাপ থাকলে এইরকমই হয়, সব প্রিয় জিনিস অপ্রিয়।

শিপুর হঠাৎ এই গ্রামটার ওপরেই রাগ হতে থাকে। নাচ-গান কিছুই নেই, শুধু-শুধু নামটাই বা রাখা কেন ? এমনি একটা সাদাসিধে নাম রাখলে চলত না ?

শিপুর মেজমাসিরাও তো গ্রামে থাকেন। গ্রামের নাম ললিতাকুঁড়ি। চলতি কথায় লালতেকুঁড়ি। তা সেই গ্রামে শিপু তার নমিদির বিয়েতে বেড়াতে গিয়ে সত্যি-সত্যি লালতেকুঁড়ি দেখতে পেয়েছিল। পুকুরের ধারে লাল-লাল, গোলাপি-গোলাপি, থোকা-থোকা ফুলের কুঁড়ি। ফুলের মতন কিন্তু ফুল নয়, কুঁড়ি। আর ওই জন্যে তো গ্রামের নামটা পর্যন্ত ললিতাকুঁড়ি।

সকাল থেকে শিপুকে এত মনমরা দেখে শিপুর দাদা সোমেনেরও মনটা কেমন যেন করছিল। তার বোনটা এই রকমই, একটা-কিছু মাথায় ঢুকলে তা নিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা ভাবে।

বোনকে কাছে টেনে সোমেন বলে, "কষে অঙ্ক কর শিপু, মন ভাল হয়ে যাবে।" শিপু রেগে যায়, "অঙ্ক পারো বলে তোমার খুব গর্ব, না ? বাবা কতবার করে বলেছেন, কখনো অহঙ্কার করতে নেই।" সোমেন বলে, "এতে অহঙ্কারের কী দেখলি তুই, তোর ভালর জন্যেই বলছিলাম।"

শিপুর সে-কথা কানে যায় না। সে চুপ করে ভাবতে থাকে কতকাল আঁগের সেই হাতি-ঘোড়া, রাজা-রানী, রাজপুত্রের কথা। আর সেই লালতেকুঁড়ি ফুটেছিল বলেই না গ্রামের নামটা পর্যন্ত ললিতাকুঁড়ি।

সন্ধেবেলা শিপুর ছোটকাকু বললেন, "বৌদি, কাল খুব ভোরবেলা ডেকে দেবে ?" শিপুর মা হেসে বললেন, "কেন, খেলা আছে ?" কাকু বললেন, "হ্যাঁ।"

শিপু তো জানেই ছোটকাকু ফুটবল খেলেন দারুণ। এখান-ওখান থেকে ডাক পড়ে। কত খেলায় কত মেডেল পেয়েছেন কাকু।

মা জিজ্ঞেস করেন, "এবার কোথায় খেলতে যাবে ?" কাকু বলেন, "সোনারপুকুর ।।"

নাম শুনে শিপু অবাক । সোনারপুকুর ! এ-রকম নাম তো শিপু কখনো শোনেনি । ঠাকুরপুকুর, পুণ্যিপুকুর, দুগ্ধপুকুর, তিনপুকুর শুনেছে, কিন্তু সোনারপুকুর ! তবে কি সেখানে সত্যি-সত্যি সোনার পুকুর আছে ? আছে না ছিল ? ছিল । এখন তো সবই ছিল । আসলে দিনকালই এইরকম হয়ে গেছে ।

শিপুর কাকু বলেন, "বৌদি, শিপুটা বড্ড রোগা হয়ে যাচ্ছে, ওকে ভাল করে খাওয়াও, দেখছ না আজকাল কথাবার্তাও কম বলে ।"

ছোটকাকু শিপুর মাছের কাঁটা বেছে খাইয়ে দেন । বাটা মাছ শিপুর একটুও ভাল লাগে না, তবু খায় । এখন ছোটকাকুকে চটাবার এতটুকু ইচ্ছে নেই ওর । সোনারপুকুর নামটা শোনা পর্যন্ত ও ঠিক করে ফেলেছে, কাকুর সঙ্গে ওই গ্রামে যেতেই হবে ।

শিপুর বায়না শুনে মা রাগ করে বললেন, "ও কোথায় ছুটোছুটি করে খেলবে, তুই সেখানে গিয়ে কী করবি ?"

শিপু জেদ ধরল, যাবেই ! সোনা না থাক পুকুর নিশ্চয়ই আছে, সেটাই দেখে আসবে । কিন্তু মাকে সে-কথা বলাও যায় না, একটা পুকুর দেখার জন্যে সে জেদ করছে । বললেই তো মা বলবেন, "ঝুমুরগঞ্জেই তো কত পুকুর আছে, যা দেখে আয় ।"

না, এরকম সুযোগ শিপু কখনো হাতছাড়া করতে পারে না । দরকার বুঝলে আরো চারটে বাটা মাছ খেতে সে রাজি ।

ছোটকাকু খেলার ব্যাপারে খুব সিরিয়স । কোনো রকম ঝক্কি-ঝামেলা নিতে ভালবাসেন না । এবার কী-রকম যেন মায়া পড়ে গেল, বললেন, "চলুন না বৌদি, এত ইচ্ছে যখন, সোনারপুকুরে আমার বন্ধু ইন্দ্রনারায়ণ থাকে । রাজবাড়ির ছেলে । দেখবেন শিপুকে সব্বাই কত ভালবাসবে । আদর-যত্ন করবে ।"

ইন্দ্রনারায়ণ ! রাজবাড়ির ছেলে ! সোনারপুকুরে তবে একটা রাজবাড়িও আছে ? ইন্দ্রনারায়ণ নামটা তো ঠিক রাজাদের মতনই । সে কি তবে সত্যি-সত্যি রাজপুত্র, মানে রাজার ছেলে ! রাজপুত্র যখন আছে তখন নিশ্চয়ই রাজকুমারীও থাকবে । কেমন দেখতে সেই রাজকন্যাকে ? দুধে-আলতা গায়ের রঙ ? নিশ্বাসে ফুলের গন্ধ, আর মেঘের মতন চুল ? সে কি সোনার খাটে গা আর রুপোর খাটে পা রেখে ঘুমোয় ?

দেখা হলে শিপু কী ভাষায় কথা বলবে, এইরকম ভাষা কি তারা বোঝে ? মায়ের কাছে তো শুনেছে, রাজা-রাজড়া দেব-দেবী সক্কলেই নাকি সংস্কৃতে কথা বলে । কিন্তু সংস্কৃত যে শিপু এখনও শেখেনি, জানেই না ! যাক গে, কথা না হোক, দেখা তো হবে ওই রাজবাড়ির মানুষজনের সঙ্গে ।

বেশি তো দূর নয় সোনারপুকুর, কয়েকখানা গ্রাম পেরিয়েই । এত কাছে, এমন জায়গা, শিপু জানত না । কেউ বলেওনি তো ।

গ্রামে পৌঁছেই ছোটকাকু সোজা মাঠে । মাঠটা কেমন দেখতে গেলেন । প্র্যাকটিস করতে হবে,—কাকুর চোখমুখই তখন পালটে গেছে । দলের নাম রাখতে হবে, গ্রামের মান রাখা চাই—কাকুর মুখে এই ধরনের কথা ।

শিপু রাগ করে ভাবে, ভারী তো গ্রাম ঝুমুরগঞ্জ ! নাচ নেই, গান নেই, তার আবার মান রাখা । কাকুরই দলের একজন শিপুকে রাজবাড়ি পৌঁছে দেয় । রাজবাড়ি দেখে শিপুর বুক ঢিপ্‌ঢিপ্ । বড়-বড় থামওয়ালা বিরাট একটা বাড়ি । ঢুকতেই সামনে বড় গেট, দুটো সিংহ থাবা তুলে দাঁড়িয়ে আছে, যেন লাফিয়ে পড়বে, দুটোরই কিন্তু নাক

ভাঙা। ভয়ের চেয়ে শিপুর হঠাৎ মায়াই হয়, রাজবাড়ির সিংহের নাক থ্যাবড়া করল কে ? তাছাড়া গেটে কি একটা দারোয়ানও থাকতে নেই ! যার খুশি সে ঢুকে যাচ্ছে, এখানে কি যখন খুশি রাজার কাছে যাওয়া যায় ?

কাকুর বন্ধু বলে, "ইন্দ্রনারায়ণ, এ হল অলোকেশের ভাইঝি, তোমাদের কাছে বেড়াতে এসেছে।"

ইন্দ্রনারায়ণকে হাসিখুশি দেখালেও শিপু একটুও খুশি হতে পারে না, এ কী ! এ তো একেবারে ছোটকাকুর মতন, পাজামা-পাঞ্জাবি পরা, কথাও তো বলছে বাংলায়, তা বলুক, তা বলে একটা জরির পোশাকও কি পরতে নেই ? গলায় মুক্তোর মালা কোথায় ?

বাড়ির ভেতর ঢুকে শিপু দেখে ইন্দ্রনারায়ণের মাকে। একেবারে তারই মায়ের মতন। সেইরকম সিঁদুর-পরা, লালপাড় সাদা শাড়ি। ইন্দ্রনারায়ণের বোনকে দই-চিড়ে খাওয়াচ্ছেন মা। শিপুকেও তো তার মা এইরকম দই-চিড়ে খাওয়ান।

শিপুকে আদর করে মা বলেন, "কী সুন্দর ফুটফুটে মেয়ে।"

ইন্দ্রনারায়ণের বোন বলে, "বাহ্, আমি তো এখন ওর সঙ্গে খেলব। তোমার নাম কী ভাই ? আমার নাম স্বাতী।"

স্বাতীকে শিপুর খুব ভাল লাগল। স্বাতী কতরকম ছড়া, কবিতা, গল্প জানে, কত দেশ-বিদেশের ছবি দেখায়, কিন্তু শিপুর মনের মধ্যে কী যেন খচ-খচ করে, রাজবাড়িতে থেকেও এরা কেন রাজার মতো নয় !

জিজ্ঞেস করতেও যে লজ্জা হয়। বাড়িটা কিন্তু সত্যি সুন্দর। ভারী-ভারী খাট, লতাপাতা আঁকা আলমারি, দেয়াল-জোড়া আয়না, দেয়ালে টাঙানো বিরাট-বিরাট সব ছবি, বাঘ-সিংহ-হরিণের মাথা টাঙানো। রাজাদের বাড়িতেই তো এসব থাকে, কিন্তু সোনার পুকুর ? তাও কি আছে ?

স্বাতী অবাক হয়ে বলে, "ওমা, তুমি সোনার পুকুর দেখতে এসেছ ? তাই আবার হয় নাকি ! তবে পুকুর অবশ্য একটা আছে, এ-বাড়িরই পশ্চিমদিকে, শ্বেতপাথরে চারদিকটা বাঁধানো, পদ্মফুল ফোটে, পুজোর সময় সেই ফুলেই তো দুর্গাঠাকুরের পুজো হয়। তবে কি জানো, আমার বাবার মুখে শুনেছি, আমার ঠাকুর্দার ঠাকুর্দা নাকি ওই পুকুরে মাছ ছেড়েছিলেন, সব সোনার মতন মাছ। জ্যোৎস্নারাতে মাছ ভেসে উঠলে গোটা পুকুরটাই হয়ে যেত সোনার পুকুর।"

মন খারাপ হলেও শিপু মন খারাপ হতে দেয় না। ও তো জানতই, দিনকাল এখন এইরকম—সব ছিল। কিন্তু সে রাগ করে পুকুরটা না দেখে চলে যাবে না। তাই কখনও হয় ? শ্বেতপাথরে বাঁধানো পুকুর, টলটলে জলে পদ্মফুল ফোটে। আর সেই ফুলেই যে মা-দুর্গার পুজো হয়।

ছবি: অনুপ রায়

থাইল্যাণ্ডের এক গ্রামে একজন বিদেশী পর্যটক জানতে চেয়েছিলেন, এর পরের গ্রামটি এখান থেকে কতদূরে ? অনেক ভেবেচিন্তে গ্রামের মোড়ল বললেন, 'খুব দূর নয়। ধরুন, এখানে যদি একটা বড় কুকুর চেঁচায়, সেই গর্জনটা যেখানে গিয়ে শেষ হয়ে যাবে সেখানে যদি গর্জন শুনে একটা ছোট কুকুর চেঁচায় তাহলে সেই ছোট কুকুরের গর্জন পরের গ্রামে পৌঁছোবে।'

দে'জ এর তৈরী সেরা দুটি

বহুদিনের বিশ্বস্ত কেয়ো-কার্পিন কেশ তৈল। গোটা দেশ জুড়ে হাজার হাজার সুগৃহবধূ এটি ব্যবহার করেন ও পরামর্শও দেন এটি ব্যবহার করতে। হালকা, আঠাহীন ও মৃদু সুবাসযুক্ত কেয়ো-কার্পিন চুলকে সজীব রাখে।

কেয়ো-কার্পিন

কেশ তৈল

সুবিন্যস্ত চুলের জন্য

কেয়ো-কার্পিন ম্যাসাজে অয়েল

ত্বকের পুরোদস্তুর যত্ন নিতে অপরিহার্য্য

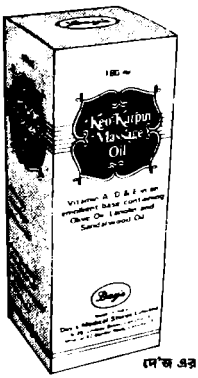

কেয়ো-কার্পিন ম্যাসাজ অয়েল। এতে আছে স্বাস্থ্যোজ্জ্বল ত্বকের জন্য প্রয়োজনীয় তিন রকম ভিটামিন ই, এ এবং ডি। এর নিয়মিত ব্যবহার ত্বককে রেশমের মতন নরম মসৃণ ক'রে তোলে। এটি যুবক-যুবতী ও বয়স্ক সবার জন্যই কাজ দেয়। শিশুদের জন্য তো কাজ দেয় বেশী করেই।

দে'জ এর দুটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন Dey's

PX'KKM/B-1/81/0

॥ ৫১ ॥

রেলওয়ে পুরস্কার পাওয়ার কথা তোমাদের আগেই বলেছি। তবে, পুরস্কার আমাকে দেওয়া হয়েছিল উনিশশো একষট্টি সালে নয়, উনিশশো বাষট্টি সালে। আমার নেতৃত্বে সর্বভারতীয় রেল একষট্টির সন্তোষ ট্রফি জয় করলেও, ফাইনাল হয়েছিল বাষট্টির জানুয়ারিতে। এই রেলওয়ে পুরস্কার আমার আগে ইস্টার্ন রেলের আর-একজন খ্যাতনামা ক্রীড়াবিদ পেয়েছেন—গুলজারা সিং। পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে তিনি ম্যারাথন দৌড়ে এশীয় রেকর্ড ভেঙেছিলেন। ওই গুলজারা সিং আমাকেও কম অনুপ্রাণিত করেননি। একজন মানুষ যে অমানুষিক পরিশ্রম ও শারীরিক কষ্টকে কী আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করতে পারেন, তাঁকে না দেখলে জানতে পারতাম না।

একটা গল্প বলি। গল্প হলেও সত্যি। গুলজারা সিং ছিলেন একজন মেশিনম্যান, চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী। তাঁর সবচেয়ে ওপরওয়ালা ছিলেন ইস্টার্ন রেলের ফুটবল-সম্পাদক নিলু মিত্র। মিত্রসাহেব রোজ গুলজারাকে একজোড়া লাল কেডস কিনে দিতেন, যার দাম ছিল দু'টাকা বারো আনা। ঐরকম কেডস এখন আর পাওয়া যায় না। তাঁকে হাজার টাকা দিয়ে একটা মহিষও কিনে দেওয়া হয়েছিল, দুধ খাওয়ার জন্য।

রোজ সকালে ধর্মতলা থেকে দৌড় শুরু করে প্রায় তিরিশ মাইল দৌড়ে গুলজারা ডায়মণ্ড হারবার পর্যন্ত গিয়ে, বাসে চেপে কলকাতায় ফিরে আসতেন। দৌড়োতে দৌড়োতে ঐ কেডস প্রায় রোজই ফুটো হয়ে যেত! এই ছিল তাঁর প্র্যাকটিস।

তিনি বিশ্ববিশ্রুত দূরপাল্লার দৌড়বীর এমিল জ্যাটোপেকের সঙ্গেও দৌড়েছেন। সে-দৌড় আমি দেখেছি। জ্যাটোপেক দেশে ফিরে যাবার আগে তাঁর নিজের কেডস আর গেঞ্জি গুলজারাকে উপহার দিয়ে গিয়েছিলেন।

অদ্ভুত ঠাণ্ডা নরম মানুষ ছিলেন গুলজারা। উনিশশো আটান্ন সালে টোকিও এশিয়ান গেমসে প্রচণ্ড গরমে দৌড়োতে দৌড়োতেই তিনি লুটিয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু তার পরেও তিনি অনেকবার চমকপ্রদ সময়ে ম্যারাথন দৌড়েছেন। অমানুষিক পরিশ্রম করে আমাকে অনুপ্রাণিত করেছেন তিনি।

উনিশশো বাষট্টির জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে রেলের অ্যাথলেটিক স্পোর্টস্। তাতে যোগ দিচ্ছেন রেলের অনেক বিখ্যাত অ্যাথলিট, তখন একটি বিশিষ্ট নাম—সুজিত সিংহ। ১০০, ২০০ এবং ৪০০ মিটার দৌড়ে তাঁর প্রচণ্ড খ্যাতি। সার্ভিসেসের অ্যাথলিট থেকে পি এন মুখার্জি এসেছিলেন রেলে।

বললাম, ইস্টার্ন রেল স্পোর্টসে আমিও নামব! শুনে চমকে উঠলেন কে কে দাস এবং নিলু মিত্র। দাসসাহেব বললেন, "প্রদীপ, এটা তো ফুটবল নয়। অ্যাথলেটিক স্পোর্টস এমন হুট করে করা যায় না। তুমি কিন্তু করতে পারবে না।"

আমি বললাম, "ঠিক আছে স্যার, দেখা যাবে।" দাসসাহেব বোধহয় জানতেন না যে অল্প বয়সে আমি অ্যাথলিট হিসেবেই

বেশি নাম করেছিলাম। জানলেও হয়তো গুরুত্ব দিতে চাননি। মাঝের দিন-পনেরো মন দিয়ে প্র্যাকটিস করলাম।

শুনে অবাক হবে ছোট্ট বন্ধুরা, ১০০ ও ২০০ মিটার দৌড়, ৪০০ মিটার হার্ডল রেস আর ব্রড জাম্পের ফাইনালে উঠলাম। এবং ৪০০ মিটার হার্ডল রেসে তখনকার চ্যাম্পিয়নকে হারিয়ে ফাইনালে প্রথম স্থান পেয়ে গেলাম। সময় লাগল ৬০ সেকেণ্ড। নামী অ্যাথলিটরা আমায় জড়িয়ে ধরলেন।

১০০ মিটার ১১·১ সেকেণ্ডে এবং ২০০ মিটার ২৩ সেকেণ্ডে দৌড়োলাম। ব্রডজাম্প করলাম ১৯ ফুট। তখন সকলেই বুঝলেন, অ্যাথলেটিক্স নিয়ে থাকলে আমিও অনেক ওপরে উঠতে পারতাম। বুঝলেন, আমি নিজের সম্পর্কে বাড়িয়ে কিছু বলি না, যা করি সাধ্যমতো নিষ্ঠার সঙ্গেই করার চেষ্টা করি।

রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ অসুস্থ থাকায় আমাদের হাতে অর্জুন পুরস্কার তুলে দিলেন উপরাষ্ট্রপতি সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণান। দার্শনিক হিসাবে তাঁর জগৎজোড়া খ্যাতি। আমি ছাড়াও, ঐ প্রথম বছরে অর্জুন পুরস্কার পেলেন ব্যাডমিন্টন ও টেনিসের দুই উজ্জ্বল তারকা নান্দু নাটেকার এবং রমানাথন কৃষ্ণান। ঐ আসরে প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু হাজির ছিলেন, বিশিষ্ট অতিথি হিসাবে ছিলেন জ্যাকুলিন কেনেডি।

পুরস্কার বিতরণের পর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণান আমাদের সঙ্গে কথাবার্তা বললেন। কথায় কথায় বললাম, "এত সাংসারিক সমস্যা, হয়তো আর খেলা চালিয়ে যেতে পারব না।"

তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার বয়স কত?"

"ছাব্বিশ।"

"তাহলে ছাড়ার কথা ভাবছ কেন, একত্রিশ-বত্রিশ বছর পর্যন্ত তো অবশ্যই খেলা উচিত।"

সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণান সেদিন একটি উপদেশ দিয়েছিলেন "মনঃসংযোগটাই আসল জিনিস। যখন যা করবে, মন দিয়ে করবে। মন দিয়ে না খেলে হজম হয় না। যখন খেলবে, মন দিয়ে খেলবে। যখন অফিসে ফাইল খুলে কাজ করবে, মন দিয়ে করবে, যেন কাজে কোনও ভুল না হয়। মনঃসংযোগই জীবনের সাফল্যের মূল সূত্র।"

সত্যদ্রষ্টা ঋষির সেই উপদেশ আমি কখনও ভুলিনি, যখন খেলেছি বা পরবর্তী সময়ে প্রশিক্ষণ দিয়েছি এবং দিচ্ছি, আন্তরিক থেকেছি, মনঃসংযোগ হারাইনি।

এখনকার মতো তখন অর্জুন-পুরস্কারবিজয়ীকে ব্রেজার দেওয়া হত না, দু'বছরের জন্য মাসে দুশো টাকা করে স্টাইপেণ্ড দেওয়া হত না, এমন-কী লক্ষ্যভেদী অর্জুনের ব্রোঞ্জনির্মিত স্ট্যাচুও দেওয়া হয়নি। শুধু একটি মানপত্র।

কলকাতায় ফিরেই প্রস্তুতি, হায়দরাবাদে

ভাল ছেলে

অমলকান্তি ঘোষ

দারুণ ভাল ছেলে শমীক রায়।
বুদ্ধি বাড়াবার টনিক খায়।
কালকে সারারাত
পড়েছে ধারাপাত—
আজকে বসবে সে পরীক্ষায়।

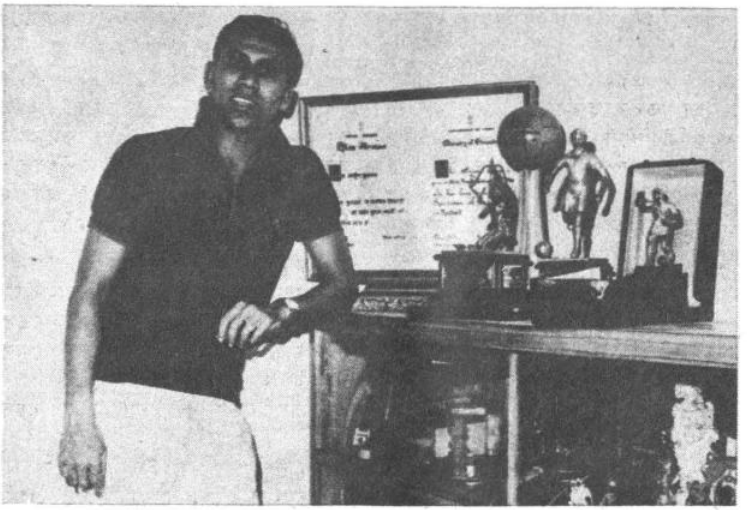

অর্জুন পুরস্কার (১৯৬২) পাওয়ার পরে পি. কে.

যাওয়ার জন্য। জাকর্তা এশিয়ান গেমসের জন্য সেখানেই ফুটবলারদের ক্যাম্প বসাচ্ছেন রহিমসাহেব। ট্রেনিং চলবে ছয় থেকে আট সপ্তাহ। রহিমসাহেব জানতেন, প্রথমেই ছেলেদের শরীর উপযুক্ত করে তোলা দরকার। কারণ ক্লাব-ফুটবলের সঙ্গে আন্তর্জাতিক ফুটবলের আকাশপাতাল তফাত। রহিমসাহেবের কাছাকাছি কোনো কোচ ভারতবর্ষে ছিলেন না। আমার পরমশ্রদ্ধেয় বাঘা সোম বা বলাইদাস চট্টোপাধ্যায়—এঁরা কোচিং সম্পর্কে তাঁর মতো এত-কিছু জানতেন না।

আট সপ্তাহ প্রচণ্ড পরিশ্রম করালেন রহিমসাহেব। ফিজিকাল ট্রেনিংয়ের সঙ্গে-সঙ্গে খেলাও চলল। একদিন মুষলধারে বৃষ্টি হওয়ায় আমরা রহিমসাহেবকে বললাম, প্র্যাকটিস বন্ধ থাক! সেদিন ইনডোরে মেডিসিন নিয়ে এমন ট্রেনিং করালেন যে, পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে মাটিতে পা ফেলতেই কষ্ট হচ্ছিল।

সকালে স্কিল, গ্রুপ প্র্যাকটিস, শুটিং—সবই করা হত। রহিমসাহেব নেট আর শুটিং বোর্ডের ব্যবস্থা করেছিলেন। দু'বেলা বুট পরেই স্টেডিয়াম বেয়ে আমাদের উপরে উঠতে হত এবং তারপর তিনবার মাঠ ঘুরতে হত। ঐ 'ল্যাপ' দিতে হত ট্রেনিংয়ের শেষে, যখন আমরা দারুণ ক্লান্ত। একদিনের একটা ঘটনা তোমাদের শোনাই।

গোলকিপাররা সাধারণত বেশি দৌড়াদৌড়ি করতে চান না। এখনকার ভাস্কর-ব্রহ্মানন্দ যেমন, তখনকার থঙ্গরাজ-বর্মনও তেমনই।

রহিমসাহেব একদিন লক্ষ করলেন, স্টেডিয়ামে ওঠার পথে এক জায়গায় বর্মনকে নিয়ে লুকিয়ে থাকেন থঙ্গরাজ। আমাদের বিশ্রাম দিয়ে সেদিন থঙ্গরাজ আর বর্মনকে তিনি স্টেডিয়াম বেয়ে এতবার উঠতে বললেন যে, ওঁরা দুজন আর-একটু

হলেই কেঁদে ফেলেন আর-কি !

চুনী, বলরাম বা আমি কোনো ভুল করলে রহিমসাহেব মেনে নিতে পারতেন না। একটা ভুল পাস করলেও মনে রেখে পরদিন ক্লাসে বলতেন, "কী লজ্জার কথা, পি কে-ও (বা চুনী বা বলরাম) ভুল পাস করছে !"

এই পাসিংয়ের ব্যাপারে তিনি খুব খুঁতখুঁতে ছিলেন। সামান্য ভুলের জন্য আমাদের ক্লাসের মধ্যে সবার সামনে অপমানও করেছেন। আমরা অবশ্য তাঁর সব কথাই সহজভাবে গ্রহণ করতাম। জানতাম, তিনি আমাদের এবং ভারতীয় ফুটবলের ভালর জন্যই ঐসব কথা বলছেন।

যেদিন এশিয়ান গেমসের জন্য ভারতের দল ঘোষণা করা হবে, তার আগের দিন ভোরবেলায় মশারি তুলে আমার ঘুম ভাঙিয়ে খগরাজ বললেন, "গুড নিউজ পিকে, তুমি আবার ইণ্ডিয়ার ক্যাপ্টেন হচ্ছ !"

কথাটা শুনে স্বভাবতই খুশি হলাম। কিন্তু কাগজ খুলে দেখলাম, কিছুই ঠিক হয়নি। ঐ পত্রিকায় শুধু লেখা হয়েছে, পি কে ব্যানার্জিকেই এশিয়ান গেমসেও ভারতের অধিনায়ক করা উচিত। কিন্তু, পিছন থেকে কলকাঠি নড়ানো চলছিলই।

পরদিন রহিমসাহেব আমাকে ডেকে বললেন, "কী বলব পি কে, তোমাকে অধিনায়কত্ব থেকে হটানোর চেষ্টা বাংলার দিক থেকেই হচ্ছে। হয়তো তুমি এবার ক্যাপ্টেন হবে না। শুধু একটা কথা বলি, যে-ই ক্যাপ্টেন হোক, তুমি প্রাণ দিয়ে খেলবে। আমার কাছে তোমার একটাই পরিচয়—আদর্শ স্পোর্টসম্যান।"

গোটা দিন ধরে কত কী যে ঘটল ! সেসব নোংরা ঘটনা আর মনে করতে বা বলতে চাই না। শেষ দু-তিন দিনের ট্রায়াল-ম্যাচে আমাকে দ্বিতীয় টিমে খেলতে হল, কারণ নাকি ফর্ম ভাল নেই ! কিন্তু ভাগ্যের এমনই খেলা, ঐ দু-তিনদিনই আমার দেওয়া গোলে প্রথম দলকে হার মানতে হল।

হায়দরাবাদে দল ঘোষণা করা হল না। কারণটা বুঝলাম। ট্রেনে ফেরার সময় কয়েকজন ফুটবলার-বন্ধু বলল, 'কানাঘুষো শুনছি, তুই নাকি ক্যাপ্টেন থাকছিস না !'

দুজন নির্বাচক আমাদের সঙ্গে এক ট্রেনেই ফিরছিলেন। কিছুটা অস্বাভাবিক অবস্থায় আমার সামনে দাঁড়িয়ে একজন বললেন, "তুমি ক্যাপ্টেন হলে তো আর কেউ ক্যাপ্টেন হবার সুযোগই পাবে না। তুমি আরও বেশ কয়েক বছর খেলবে ; তাই ভেবে দেখলাম, অন্যার শুড গো রাউণ্ড !"

দুঃখের কথা হল, এই নীতির কথা আমার আগে বা পরে ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন মনে রাখেনি। কলকাতায় পৌঁছেই জেনে গেলাম, এশিয়ান গেমসে ভারতের অধিনায়কত্ব করবেন চুনী গোস্বামী। (ক্রমশ)

বিখ্যাত দার্শনিক ও প্রবন্ধকার র‍্যালফ্ ওয়ালডো ইমারসন প্রতিটি মানুষের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে ও স্বকীয়তায় আস্থাবান ছিলেন। এ-বিষয়ে তাঁর বক্তব্যটি অতি চমৎকার। 'তুমি কিছুতেই চাইবে না যে, আর কেউ ঠিক তোমারই মতো হোক; তুমি জানো এবং ভগবানও জানেন, একজন তুমিই যথেষ্ট, দুজন বা তিনজন তুমি দরকার নেই।'

ধাঁধা

"সত্যবাদী আর মিথ্যেবাদী নিয়েই এবারের ধাঁধা। কিন্তু সেই বৃক্ষবাসী-গুহাবাসী হিসেবে নয়। একেবারে সরাসরি।" ছোট্কা হাতের বইটা খুলতে-খুলতে বলল।

কথাটা শুনেই আমার মনে পড়ে গেল, বৃক্ষবাসী আর গুহাবাসী নিয়ে ছোট্কার বলা সেই মজার ধাঁধাগুলো কী দারুণ ইন্টারেস্টিং ছিল! কাগজ আর কলম নিয়ে তক্ষুনি বসে পড়ি পাশের টেবিলটার সামনে।

ছোট্কার বলা ধাঁধাটা দিয়েই এবারের শুরু।

প্রথম ধাঁধা ॥ একটা ক্লাবের কিছু সদস্য সত্যবাদী, কিছু মিথ্যেবাদী। সত্যবাদীরা সব সময়ই সত্যি কথা বলেন, মিথ্যেবাদীদের প্রতিটি বাক্যই মিথ্যে। কিন্তু বাইরে থেকে বোঝার জো নেই, কে কোন্ দলে পড়ে।

একজন রিপোর্টার একবার সেই ক্লাবে গেলেন ঐঁদের দেখে আসতে। বিরাট গোলটেবিল ঘিরে সদস্যরা বসে আছেন। প্রতিটি চেয়ার ভর্তি। রিপোর্টারের দারুণ কৌতূহল হল। কজন সদস্য সত্যবাদী, কজন মিথ্যেবাদী নিজে যাচাই করে দেখতে চাইলেন।

প্রতিটি সদস্যকে তিনি নিজে জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি সত্যবাদী না মিথ্যেবাদী। উত্তরে প্রত্যেকেই একই কথা বললেন, "আমি সত্যবাদী।"

রিপোর্টার তখন অন্যভাবে ঘুরিয়ে প্রত্যেক সদস্যের কাছে আরেকটি প্রশ্ন রাখলেন। প্রশ্নটি হল—"আপনার ঠিক বাঁ দিকে যিনি বসে আছেন তিনি কী?"

আশ্চর্য ব্যাপার, এবারও প্রত্যেক সদস্য একই উত্তর দিলেন। উত্তরটি হল—"বাঁ দিকে যিনি বসে আছেন তিনি মিথ্যেবাদী।"

রিপোর্টারটি সম্পূর্ণ হকচকিয়ে গেলেন। তিনি হতাশ হয়ে ফিরে এলেন নিজের অফিসে।

সন্ধেবেলা তাঁর হঠাৎ মনে পড়ল। আচ্ছা, ঐঁদের মোট কজন সদস্য তা তো গোনা হয়নি। সবাই যে উপস্থিত ছিল, সেটা তিনি জানতেন। কেননা, চেয়ার একটাও ফাঁকা দেখেননি। কিন্তু মোট সদস্য কজন, গোনেননি।

তখন তিনি ক্লাবের প্রেসিডেন্টকে ফোন করলেন। প্রেসিডেন্ট জানালেন, মোট সদস্য-সংখ্যা হল ২৭।

ফোনটা রেখেই রিপোর্টার আবার সংশয়ে পড়লেন। প্রেসিডেন্ট নিজে যে কী—সত্যবাদী না মিথ্যেবাদী—সেটাই তো জানেন না। রিপোর্টার আবার ফোন করলেন। এবার করলেন ভাইস প্রেসিডেন্টকে। তিনি বললেন, "প্রেসিডেন্ট মিথ্যেবাদী। আমাদের সদস্য-সংখ্যা হল ৩০। সবাই আজ ছিল।" ফোনটা ছেড়ে রিপোর্টার নতুন করে ভাবতে বসলেন।

ভাইস প্রেসিডেন্ট আর প্রেসিডেন্ট—ঐঁদের মধ্যে কে যে সত্যবাদী আর কে যে মিথ্যেবাদী বলতে পারো? রিপোর্টারটি কিন্তু এটা একটু পরেই বার করতে পেরেছিলেন।

দ্বিতীয় ধাঁধা ॥ বন্ধনীর মধ্যে এমন-একটা শব্দ বসাও যাতে বাইরের বাঁ দিকের শব্দ শেষ হয়, ডান দিকের শব্দ শুরু হয়।

অন্( )স্থায়ী

গতবারের উত্তর ॥ (১) ১৫টি। (২) অব (তার) তম্য। (৩) ৯০।

সত্যসন্ধ

শব্দ-সন্ধান

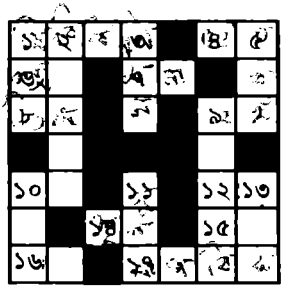

সংকেত পাশাপাশি (১) নিভৃত স্থান। (৪) চাষের জমি। (৬) কল্যাণ। (৭) যাঁর বচনের খুব প্রসিদ্ধি আছে। (৮) কোন্ শস্য আমাদের শরীরেও থাকে? (৯) কৌতুক। (১০) রামায়ণোক্ত রাক্ষস। (১২) একটি স্ত্রী-প্রত্যয়। (১৪) প্রাচীন অস্ত্রবিশেষ। (১৫) খাদ-মেশানো সোনা। (১৬) খরগোশ। (১৭) রাষ্ট্রের প্রজা।

উপর-নীচ (১) গভীর রাত। (২) অগ্ন্যস্ত্রবিশেষ। (৩) লেখা। (৫) ঢেউ। (৯) কৈলাস পর্বত। (১০) বিষধর সাপ। (১১) বাংলাদেশের একটি জেলা। (১৩) মূল্যবান রত্ন।

সমাধান আগামী সংখ্যায়

গত সংখ্যার সমাধান

	কা	লা	পা	হা	ড়	
বো		জ	ঞ্জা	ল		গী
ত	ক্র		ব		ন	ত
ল	ক	ড়ি		অ	ক	বি
ব	চ		চ		ল	তা
ন্দী		তা	র	কা		ন
	অ	স	ম	ত	ল	

মজার খেলা

ষোলটা ফুটকিচিহ্ন এঁকে বন্ধুদের সামনে ধরে একটানে ছটা সরলরেখা এমনভাবে আঁকতে বলতে হবে যাতে সব-কটা ফুটকিচিহ্নের ওপর দিয়েই রেখাগুলো যাবে—এমন একটা খেলা আমরা আগে শিখেছি। এবার সেই রকমই আর-একটা খেলা শিখব। আরও একটু কঠিন, এই যা তফাত।

নীচের ছবিতে যেমন দেখানো রয়েছে তেমন পঁচিশটা ফুটকিচিহ্ন এঁকে বন্ধুদের সামনে সাদা কাগজটা আর একটা পেন্সিল ধরো। এবার বলো, কাগজ থেকে পেন্সিল না-তুলে একটানে ন্যূনতম কটা সরলরেখা সে আঁকতে পারে—যাতে সব-কটা ফুটকিচিহ্নই ছুঁয়ে যাবে?

দেখবে, বন্ধুর উত্তর হচ্ছে কম করেও নটা সরলরেখা।

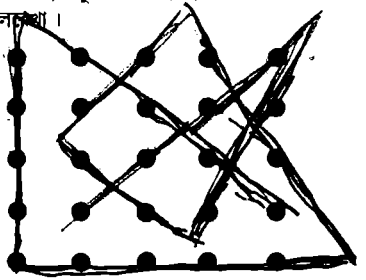

কিন্তু নটা হলে চলবে না। আটটা সরলরেখা টেনেই পঁচিশটা ফুটকিচিহ্ন ছুঁতে হবে। আর সেখানেই তো খেলাটার মজা।

কিন্তু আটটা রেখা টানা মোটেই সহজ কাজ নয়। তাই কীভাবে কী হবে, নীচের ছবিটা থেকে ভাল করে দেখে নাও—

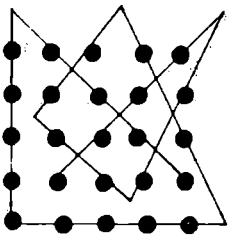

মজারু

কিসের ফোটো

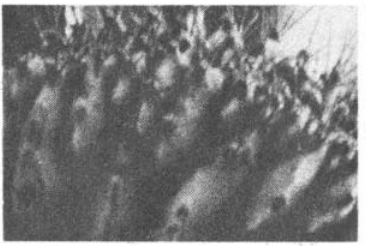

সমাধান আগামী সংখ্যায়

গত সংখ্যায় ছিল উঁচু বাড়ির ফোটো
ফোটো তপন দাশ

উত্তর বটে

প্রঃ আপনাদের দোকানে আট-এগারো সাইজের জানালার কাঁচ আছে ?

উঃ না, ও সাইজটা নেই, তবে এগারো-আট আছে। সেটা আড় করে লাগালে কেউ ধরতেই পারবে না যে ভুল সাইজের কাঁচ।

প্রঃ কারা একমাত্র ব্রহ্মাকেই ঈশ্বর বলে বিশ্বাস করেন ?

উঃ ব্রহ্মদেশের লোকেরা স্যার।

প্রঃ সুন্দর পার্কটাকে এত কাগজ ফেলে নোংরা করল কারা ?

উঃ এদিক-ওদিক কাগজপত্র না ফেলবার জন্যে কর্পোরেশনের মেয়র গতকাল মিটিং-এ যে প্রচারপত্র বিলি করেছিলেন, এগুলো সেই কাগজ।

প্রঃ মুরগি চুরির অপরাধে তোমার বিচার হচ্ছে, কিন্তু তুমি বলছ তোমার উকিল দেবার ক্ষমতা নেই। কোর্ট থেকে বিনে পয়সায় তোমার জন্য উকিল ঠিক করে দেব ?

উঃ না না ধর্মাবতার, সে আবার মুরগির ভাগ চাইবে।

সুসেন

হাসিখুশি

এক বিখ্যাত ভদ্রলোক বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। সবাই চুপচাপ শুনছেন। হঠাৎ পেছন থেকে একজন চেঁচিয়ে উঠলেন, "রাবিশ।"

বক্তা বক্তৃতা থামিয়ে মৃদু হেসে বললেন, "আপনি দয়া করে একটু শান্ত হয়ে বসুন। আমি কিছুক্ষণের মধ্যেই আপনার 'রাবিশ' বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব।"

●

প্যারিসের এক অভিজাত রেস্তোরাঁয় গিয়ে এক ভদ্রলোক মহা বিপদে পড়লেন। ফরাসি ভাষার তিনি বিন্দুবিসর্গ বোঝেন না। সুদৃশ্য মেনুকার্ডের শেষ লম্বা লাইনটি দেখিয়ে ওয়েটারকে খাবার আনতে বললেন। ওয়েটার সবিনয়ে জানাল, "দুঃখিত স্যার। ওটি কোনো খাবার নয়; আমাদের রেস্তোরাঁর মালিকের নাম।"

●

"স্যার, এক্ষুনি আমার সঙ্গে চলুন। আমাদের পাড়ার রামুদাকে একটা লোক আধঘণ্টা ধরে ঠ্যাঙাচ্ছে।"

"আধঘণ্টা ধরে ঠ্যাঙাচ্ছে! সে কী! খবরটা এতক্ষণ পরে দিচ্ছেন কেন।"

"আগে খবর দিতে যাব কেন স্যার? এতক্ষণ তো রামুদাই জিতছিল।"

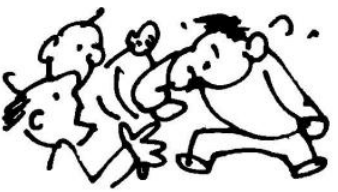

"আপনার কুকুরের গায়ের মাপ জানি না। কী করে তার কোট বানাব ? আপনি বরং আপনার 'লুসি'কে একদিন আনুন, তার মাপ-টাপ নিয়ে চমৎকার একখানা কোট বানিয়ে দেব।"

"উঁহু, তা হবে না। আমি চাইছি হঠাৎ একটা উপহার দিয়ে লুসিকে একেবারে অবাক করে দেব।"

ছবি: অহিভূষণ মালিক

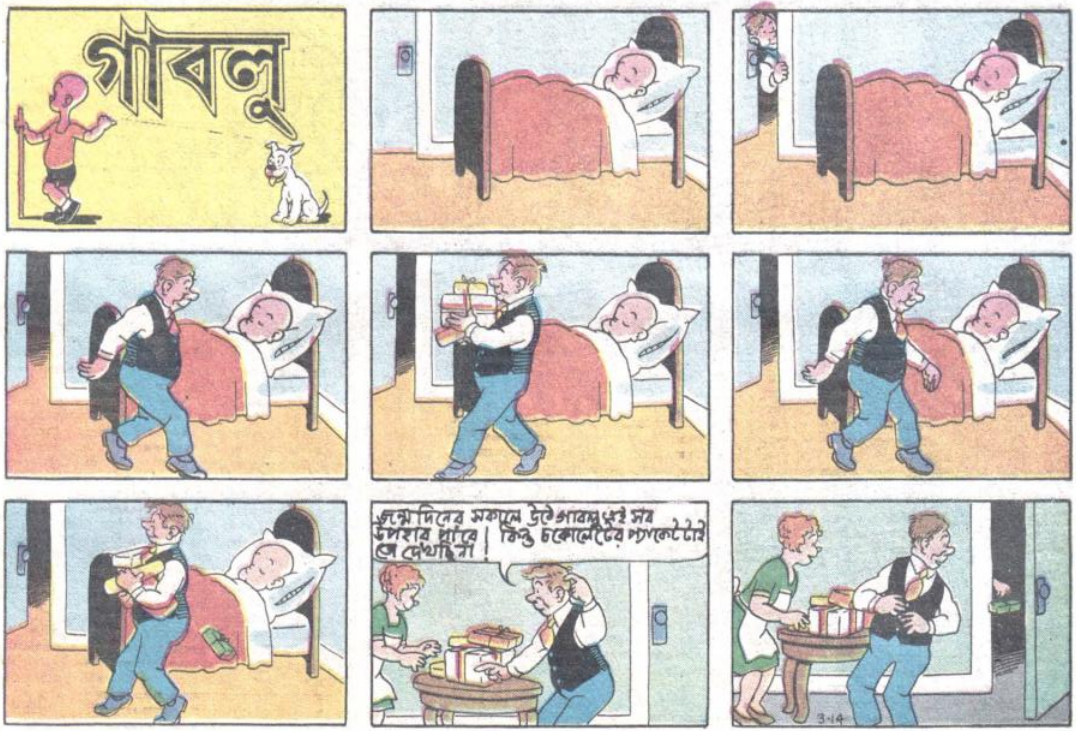

গাবলু
জন্ম দিনের সকালে উঠে গাবলু এই সব উপহার পাবে। কিন্তু চকোলেটের প্যাকেটটাই যে দেখছি না!
3-14

বিরাশির বিশ্বকাপের ব্রাজিল দল (শক্তি অসামান্য, সাফল্য কম) ফোটো কালারস্পোর্ট

ব্রাজিল কেন হারল

শ্যামসুন্দর ঘোষ

স্পেন থেকে দেশে ফিরে আসার পরে যার সঙ্গেই দেখা তারই প্রথম প্রশ্ন : ব্রাজিল হারল কেন ?

ব্রাজিলের বিরুদ্ধে খেলার আগে ইতালির প্রশিক্ষক বারজোত নিজেই সাংবাদিকদের বলেছিলেন—ব্রাজিলের ফুটবলের সঙ্গে অন্য কোনো দেশের ফুটবলের তুলনা চলে না। আর্জেন্টিনার কোচ মেনোত্তির বক্তব্য ব্রাজিলের সৃজনশীল ফুটবল ওই দেশকে এক স্বতন্ত্র মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছে। দেশ-বিদেশের সাংবাদিকরা বিশ্বকাপের খেলা শুরু হবার আগেই ভবিষ্যদ্বাণী করে রেখেছিলেন ব্রাজিল এবার চ্যাম্পিয়ন হবে। কিন্তু চ্যাম্পিয়নশিপের প্রশ্ন তো দূরের কথা ব্রাজিল সেমিফাইনালেও উঠতে পারল না।

স্পেনে ২৪টি দেশ নিয়েগড়া বিশ্বকাপের প্রথম পর্যায়ের খেলায় যে-দুটি দল গ্রুপের সবকটি ম্যাচে জিতেছিল তারা হল ব্রাজিল ও ইংল্যাণ্ড। তবে ইংল্যাণ্ডের চেয়ে জনপ্রিয় ছিল ব্রাজিল, কারণ তারা চমৎকার আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলেছিল। তিনটি খেলায় ব্রাজিল গোল করেছিল দশটি, ইংল্যাণ্ডের গোলের সংখ্যা ছয়।

ব্রাজিলের এই জনপ্রিয়তার পেছনে ওই দেশের ফুটবল-প্রেমিক দর্শকদের অবদানও অনেকখানি। ব্রাজিল-আর্জেন্টিনার খেলার শেষে বার্সিলোনার রাস্তায় হলুদ জামা গায়ে প্রায় হাজার-ছয়েক ব্রাজিলবাসী জাতীয় পতাকা হাতে নিয়ে নেচেছিলেন। সে-দৃশ্য এখনও আমার চোখে ভাসছে। সেদিন ওই আনন্দের অংশ নিতে অলিন্দ থেকে নেমে এসেছিল স্পেনের কয়েক শো কিশোর-কিশোরী। রাস্তায় জট সরাতে ব্যস্ত পুলিশ-বাহিনী বা গাড়ি-বন্দী আরোহীরাও এই বিজয়-উৎসবে নিজেদের জড়িয়ে ফেলেছিলেন। ব্রাজিল-ইতালির খেলার

॥ বিজ্ঞানের যুগ ॥

হিসেব করলে দেখা যায় যে ভারতে পেট্রল বা পেট্রলজাত দ্রব্য সারা বছরে মোট যা ব্যবহার হয়, (প্রায় দু'কোটি টন) আমেরিকার তাতে এগারো দিন চলে। কথাটা উল্টে বললে দাঁড়ায় যে—আমাদের দেশ গরীব বটে, তবে আমরা উন্নত দেশগুলির তুলনায় পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে দূষিত পদার্থ খুব কম মেশাচ্ছি।

তাহলে কি ভারতবর্ষ অন্তত একদিক দিয়ে আমেরিকার তুলনায় উন্নত, এই কথাটাই বোঝাচ্ছে? না তা নয়। কারণ তোমরা জান যে জ্বালানি পোড়ানোর দরকার হয় শক্তি বা 'এনার্জি' তৈরীর জন্য আর যে দেশ যত উন্নত তার এনার্জি'র খরচও তত বেশী। কিন্তু আজকের দিনে এমন ধরণের শক্তি উৎপাদনের উৎস দরকার যা পুড়লেও বায়ু দূষণের কোন পদার্থ তৈরী হয় না। যেমন,—এ্যালকোহল, ন্যাচারাল গ্যাস বা হাইড্রোজেন গ্যাস কিংবা সামুদ্রিক জোয়ার-ভাঁটা, সৌরশক্তি থেকে উৎপন্ন শক্তি বা 'এনার্জি'। অর্থাৎ আজ হ'ল বৈজ্ঞানিক ও প্রয়োগ কুশলীদের এগিয়ে আসার দিন। এছাড়াও এখন 'কমপিউটার' চালু হয়েছে এবং এই যন্ত্রের সাহায্যে অনেক ক্ষেত্রে অনেক প্রগতি করা সম্ভব হচ্ছে। যুগটা যখন বিজ্ঞানের, তখন, বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কার আর প্রয়োগ সম্বন্ধে তোমরা প্রথম থেকেই সচেতন হও। শুধু বই পড়ে নয়, ব্যবহারিক জীবনেও।

(জনসংযোগ বিভাগ, সি. এম, ডি, এ ৩এ, অকল্যাণ্ড প্লেস, কলকাতা- ১৭ থেকে প্রচারিত)

আসল কে আর নকলই বা কে ?

এ প্রশ্নের জবাব তো অতি সোজা। যার নামে তালমিছরি বিক্রী হচ্ছে তার সই আছে কিনা দেখে নিন। ঠকবেন না।

দুলালের তালমিছরি

এলোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি কবিরাজী বা হাকিমী —সব চিকিৎসাতেই সর্বসম্মত পথ্য

৪৮ বছরের অভিজ্ঞতা নিয়ে আপনার, জাতির এবং দেশের সেবায়

প্রস্তুতকারক

শ্রীদুলালচন্দ্র ভড়

২৮ বনমালী সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০০৫ টেলিফোন — ৩৩৮২-৮৪

দিন সাত সকালে আমার ঘুম ভাঙিয়ে ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের কর্মসচিব অশোক ঘোষ ফোনে জানালেন, মন্ত্রী যতীন চক্রবর্তী, শৈলেন মান্না ও তিনি মাদ্রিদ থেকে ছুটে এসেছেন।

ব্রাজিল যখন আর্জেন্টিনাকে ৩-১ গোলে হারাল তখন সবাই ধরে নিয়েছিলেন যে, ইতালির বিরুদ্ধেও ব্রাজিল জিতবে। কারণ, ইতালি প্রথম পর্বের একটি খেলাতেও জেতেনি। ইতালি আর্জেন্টিনাকে ২-১ গোলে হারিয়েছিল, কিন্তু ব্রাজিলের খেলায় ছিল অনেক বেশি আত্মবিশ্বাসের ছাপ। অনুমান করা যেতে পারে, এই অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস ইতালির কাছে ব্রাজিলের হেরে যাবার অন্যতম কারণ। ব্রাজিল হেরে যাবার পরদিনই পাকিস্তান পার্লামেন্টের এক প্রাক্তন সদস্য মনের দুঃখে বার্সিলোনা ত্যাগ করেন। যাওয়ার আগে বলে যান, ব্রাজিল ফুটবল কর্তৃপক্ষের উচিত ওয়াল্ডার পেরেসকে কোর্ট-মার্শাল করা। একত্রিশ বছর বয়সী সাও পাওলো ক্লাবের গোলরক্ষক পেরেসকে দুটি গোলের জন্য দায়ী করা যেতে পারে। প্রায় বিশ গজ দূর থেকে আলতো করে মারা শটে রোসি যেভাবে শেষ গোলটি করেছিলেন সেটি আমাদের কলকাতার মাঠের সাধারণ গোলরক্ষকরাও আটকাতে পারত। তবে শুধু পেরেসকে দোষ দিয়ে লাভ নেই, ব্রাজিলের ডিপ-ডিফেন্সের খেলোয়াড়দের, বিশেষ করে দুই উইং-ব্যাককে, দুটি গোল খাওয়ার জন্যে দায়ী করা চলে। উইং-ব্যাকরা এগিয়ে গিয়ে ঠিক সময়ে ফিরতে পারেননি। সুযোগ বুঝে ইতালির খেলোয়াড়রা লম্বা ক্রসে ওই ফাঁকা জায়গায় বল পাঠিয়েছিলেন। ব্রাজিলের ভাগ্য ভাল যে, আরো গোল খায়নি। দ্বিতীয়ার্ধর শুরুতে ইতালি যখন ২-১ গোলে এগিয়ে, তখন পাওলো রোসি পেরেসকে অসহায় পেয়েও গোলের বাইরে বল পাঠিয়েছিলেন। ব্রাজিল অবশ্য গোল করার আরো বেশি সুযোগ পেয়েছিল, কিন্তু কাজে লাগাতে পারেনি। এ-ব্যাপারে সবচেয়ে ব্যর্থ সার্জিনো।

ব্রাজিলের বিরুদ্ধে ইতালির যে জেতার সম্ভাবনা আছে, এ-সম্বন্ধে আমাদের প্রথম সজাগ করেছিলেন রামোস। উরুগুয়ের এই খেলোয়াড়টির কথা অনেকের মনে আছে নিশ্চয়ই। ইডেনে নেহরু গোল্ড্ কাপে রামোসের খেলা নিয়ে আলোচনা এখনও এ-রাজ্যের মানুষের মুখে মুখে ঘোরে।

ইতালির খেলার দিন সকালে ব্রাজিলের সাংবাদিকদের সঙ্গে যখন আমি কথা বলছি তখন রামোস ওখানে এসে হাজির হলেন। রামোস বললেন, "আমরা দক্ষিণ আমেরিকার মানুষ, আমরা চাই ব্রাজিল জিতুক। তবু আমি বলব, ইতালিকে হারানো বেশ কঠিন ব্যাপার।"

রামোসই আমাদের স্মরণ করিয়ে দিলেন, গতবার তৃতীয় স্থান নির্ধারণের খেলায় ব্রাজিলের বিরুদ্ধে ইতালি প্রথম গোল করেছিল। যদিও ব্রাজিল শেষ পর্যন্ত জিতেছিল ২-১ গোলে। রামোসের মতে ইতালির মজবুত ডিফেন্সকে ভাঙা বেশ শক্ত। ইতালি পালটা আঘাত হেনে গোল দেবার ক্ষমতা রাখে। রামোসের এই বক্তব্যের জের টেনে সেদিন প্রায় ঘণ্টা-দুয়েক আলোচনা চলেছিল। শেষে ব্রাজিলের অধিকাংশ সাংবাদিক একমত হয়েছিলেন যে, ইতালি গোল দিলেও ব্রাজিলই হবে '৮২ সালের ফুটবল চ্যাম্পিয়ন।

ব্রাজিল-ইতালির খেলার শেষে রাত্রে হোটেলে রামোসের সঙ্গে দেখা হয়েছিল আমার। বললেন, "কী বলেছিলাম, ইতালি জিতল তো।" কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে রামোসের চোখ দিয়ে দু-ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল। একটু পরে বললেন, "এবার ইউরোপীয়রা বলে বেড়াবে, তারাই বিশ্বশ্রেষ্ঠ। আর, চার বছর ধরে সে-কথা শুনতে হবে আমাদের।"

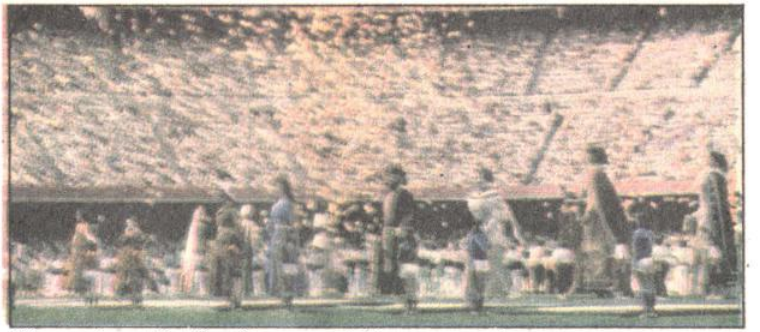

বিশ্বকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতা উদ্বোধনের সেই উত্তেজনাময় মুহূর্ত ফোটো কালারস্পোর্ট

দুই মহাদেশের দুই ফুটবল

কৃষ্ণচন্দ্র গুপ্ত

বিশ্ব-ফুটবলে কারা শ্রেষ্ঠ ? দক্ষিণ আমেরিকা, না ইউরোপ ? বহু-আলোচিত এই প্রশ্নের উত্তর আজও মেলেনি।

ইউরোপে ফুটবলের জন্ম, কিন্তু প্রথম বিশ্ব-কাপ জয় করার কৃতিত্ব উরুগুয়ের। উরুগুয়ে ফাইনালে আর্জেন্টিনাকে পরাজিত করেছিল ৪—২ গোলে। প্রথম বছর ফুটবলে দক্ষিণ আমেরিকার প্রাধান্য থাকলেও পরবর্তী দুটি আসরে ইউরোপের সাফল্য চোখে পড়ে। ১৯৩৪ ও ১৯৩৮ সালের ফাইনালে প্রতিদ্বন্দ্বী দেশগুলি ছিল ইউরোপের। ইতালি ওই দুই বছর চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল।

বিশ্ব-ফুটবলে দুই মহাদেশই চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ছবার। ফুটবল যতই জনপ্রিয় হচ্ছে ততই প্রশ্ন উঠছে : বিশ্বশ্রেষ্ঠ কারা ? গত বারের বিশ্ব-কাপ জিতেছিল আর্জেন্টিনা। এ-বছর স্পেনে ইতালি বিশ্ব-কাপ জয় করে ট্রফি জয়ে দুই মহাদেশের মধ্যে সমতা নিয়ে আসে। ইতালির তিনবারের সাফল্য ছাড়া ইউরোপের পক্ষে পশ্চিম জার্মানি জিতেছে দুবার (১৯৫৪, ১৯৭৪) ও একবার ইংল্যাণ্ড (১৯৬৬)। দক্ষিণ আমেরিকার পক্ষে ব্রাজিল তিনবার (১৯৫৮,১৯৬২ ও ১৯৭০), উরুগুয়ে দুবার (১৯৩০ ও ১৯৫০) এবং ১৯৭৮ সালে আর্জেন্টিনা।

ইউরোপীয় দেশগুলি খেলার শুরুতে গোল না খাওয়ার চিন্তা করে। দক্ষিণ আমেরিকার ফুটবলের মূল কথা হল, গোল করা বা আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলা। খেলার মধ্যে দর্শকদের টেনে আনার ব্যাপারে ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা, উরুগুয়ে বিরাট এক ভূমিকা নেয়। এবার বিশ্ব-কাপ ফুটবলে ব্রাজিল সেমি-ফাইনালে যেতে না পারলেও তাদের খেলা দর্শকদের মুগ্ধ করেছিল। ইউরোপীয় দেশগুলি পালটা আক্রমণ হানার ব্যাপারে দক্ষিণ আমেরিকার চেয়ে অনেক বেশি সচেতন। বেলজিয়ামের বিরুদ্ধে পোল্যাণ্ডের বনিয়েক এবার দুর্ধর্ষ একটি গোল করেছেন। এই গোলটির কথা অনেকদিন আমার মনে থাকবে। বনিয়েক প্রতিপক্ষের খেলোয়াড়ের পা থেকে বল কেড়ে নিয়ে মাত্র চার সেকেণ্ডে প্রায় ত্রিশ গজ ছুটে গিয়ে গোল করেছিলেন। এই ঘটনায় এটাই প্রমাণ হয় যে, ভাল ফুটবল খেলতে হলে নিজেকে অ্যাথলেটের মতো তৈরি করতে হবে। ইউরোপীয়

"পেশীর ব্যথাবেদনায় আমাকে চটপট আরাম দেয় ইউথেরিয়া"

—কপিল দেব

"বল কিংবা ব্যাট করবার সময় প্রায়ই আমার পেশীতে টান ধরে। সেই জন্যই হাতের কাছে সব সময় ইউথেরিয়া রাখি। পেশীর ব্যথাবেদনায় আমাকে চটপট আরাম দেয় ইউথেরিয়া। তাছাড়া, মাথাধরা ও সর্দিতেও এটি বেশ ভাল কাজ দেয়। ইউথেরিয়া সত্যিই নির্ভরযোগ্য।"

(কপিল দেব)

সেরা খেলোয়াড়দের পছন্দ ইউথেরিয়া

বেঙ্গল কেমিক্যাল

(ভারত সরকারের একটি উদ্যোগ)

hbb.BC.8218

Progressive-UIB 24/80

খেলোয়াড়রা গোল করার ব্যাপারে সুযোগ-সন্ধানী, সে-পরিচয় তাঁরা দিয়েছেন। গোল করতে না পারার বদনাম বেশি দক্ষিণ আমেরিকার খেলোয়াড়দের। সার্জিনো ইতালির বিরুদ্ধে বার-চারেক পেনাল্টি-বক্সের মধ্যে ঢুকে গোল করার সহজ সুযোগ নষ্ট করেছেন। অথচ ইতালির পাওলো রোসি সামান্য সুযোগ কাজে লাগিয়ে দলকে জিতিয়ে দিয়েছেন।

এবার বিশ্ব-কাপে ইউরোপীয় দেশগুলি গোল না করার বদনাম ঘুচিয়েছে অনেকটা। বিশেষ করে দ্বিতীয় পর্বের খেলায়। ইংল্যাণ্ড প্রথম রাউণ্ডে প্রত্যেকটি খেলায় জিতলেও দ্বিতীয় রাউণ্ডে কোনো গোল করতে না পেরে প্রতিযোগিতা থেকে বিদায় নেয়। একই অবস্থা সোভিয়েত রাশিয়ারও। তবে গোল করার ব্যাপারে ইউরোপের তেত্রিশটা দেশের মধ্যে একত্রিশতম স্থান ইতালির। ইতালি শেষের দিকে গোল করার ব্যাপারে যথেষ্ট মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছে।

বিশ্ব-ফুটবলে মোটামুটি সব দেশই মাঝ-মাঠের ওপর জোর দিয়েছে। বলতে গেলে সব দেশই খেলেছে একই প্রথায় (৪-৪-২)। মাঝ-মাঠের বিরাট দায়িত্ব পালনের ভার ছিল চারজন খেলোয়াড়ের ওপর। পুরোভাগের খেলোয়াড়রা যাতে সহজে প্রতিপক্ষের নজরবন্দী না হয় সে-জন্যে আক্রমণভাগে এখন খেলোয়াড়ের সংখ্যা মাত্র দুজন। ৯০ মিনিটের খেলায় একজন খেলোয়াড়ের দম দরকার ১৮০ মিনিটের। পায়ে বল থাকুক আর না থাকুক খেলোয়াড়দের মাঠে ছোটাছুটি করতে হয় সব সময়।

দুই মহাদেশের খেলায় একটা পার্থক্য বেশি করে চোখে পড়েছে। ইউরোপীয় ফুটবলে ব্যক্তিগত স্কিল প্রদর্শনের সুযোগ খুব কম। দক্ষিণ আমেরিকার ফুটবলে ব্যক্তিগত স্কিলের দিকে নজর বেশি। এর প্রমাণ মারাদোনা ও জিকোর খেলা।

রুশ গোলকিপার দাসায়েভ

আগে দেখতাম গোলরক্ষকদের

ভাস্কর গাঙ্গুলি

আগের বিশ্বকাপের ফাইনালের সময়, আমার স্পষ্ট মনে আছে, ধারাভাষ্য শোনার জন্য আমরা কী ছটফটই না করেছিলাম ! আর এবার, বিজ্ঞানের কল্যাণে, বিশ্বকাপ ফাইনাল্স আমরা ঘরে বসেই সরাসরি দেখতে পেলাম। স্পেনে যাঁরা ফাইনাল দেখেছেন, তাঁদের সঙ্গে আমাদের তফাত একটাই। তাঁরা চোখের সামনে খেলাটা দেখেছেন, আর আমরা দেখলাম টিভি-তে।

যে কটা খেলা দেখানো হয়েছে, সব কটাই দেখার ইচ্ছে ছিল খুব। কিন্তু নানা কারণে সে ইচ্ছে আর পূরণ হয়ে ওঠেনি। সে-জন্য আমার যে কী আপসোস, তা তোমাদের কী বলব !

সব পুরস্কারের
সেরা পুরস্কার
বিশ্বকাপ

সব গেঞ্জীর
সেরা গেঞ্জী
রাজু

RAJU R

গেঞ্জি • জাঙ্গিয়া • মোজা

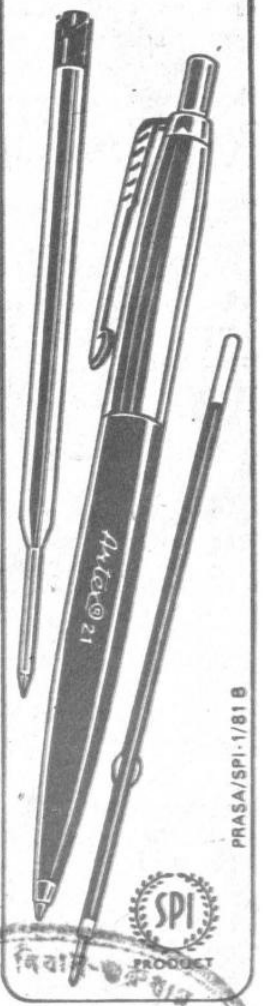

সব চেয়ে
সেরাটিই তো
আপনার হাতে
Artex®
জটার বল পেন
জটার রিফিল
বল পয়েণ্ট রিফিল
ফাইন ও একস্ট্রা ফাইন রিফিলগুলি
নীল • কালো • লাল
সবুজ
রঙেও পাওয়া যায়
PRASA/SPI-1/81 B
SPI
PRODUCT
পরিবেশক
শেঠী পেন স্টোর
ডি-১২, বাগরী মার্কেট, কলিকাতা-১
শেঠী ট্রেডার্স
বাগরী মার্কেট, কলিকাতা-১
আর্টেক্স পেন মার্ট
কনফিল্ড লেন, কলিকাতা-১

যে-কোনো খেলা শুরু হলেই, আগে আমি দুই দলের দুই গোলকিপারকে খুঁজতাম। হয়তো আমি নিজে গোলকিপার বলেই। তাঁদের হাবভাব-চালচলন খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখতাম। ওয়ার্ল্ড-কাপের গোলকিপার বলে কথা! ব্যাপারটাই তো আলাদা। তাঁরা কী করেন, তাঁদের ক্ষমতা, দক্ষতা আমাদের চিন্তার অতীত। তাঁরা কী করেন, নজর করে দেখতে হবে না! আমার খুব ভাল লেগেছে রাশিয়ার দাসায়েভ আর ক্যামেরুনের এনকোনোকে। কে শ্রেষ্ঠ—সেই বিচারে আমি মোটেই যেতে চাই না। কারণ এতখানি ভালমন্দ বিচার করার ক্ষমতা আমার হয়নি। তবে ভাল লাগার দিক দিয়ে আমার কাছে এক নম্বর রাশিয়ার ছিপছিপে চটপটে গোলরক্ষক দাসায়েভ। শুনেছি ইনি বিশ্বখ্যাত গোলকিপার লেভ ইয়াসিনের ছাত্র। বড় গুরুর পরিচর্যার ছাপ তাঁর চালচলনের প্রতিটি মুহূর্তেই স্পষ্ট। নিখুঁত সময়জ্ঞান ভদ্রলোকের। গোল ছেড়ে এগিয়ে এসে ফরোয়ার্ডের সামনে পাহাড় হয়ে দাঁড়িয়ে যাওয়া বা লাফিয়ে উঠে বিপক্ষের মাথা থেকে বল তুলে নেওয়া—দুটোই বেশ কঠিন কাজ। হিসেবের একটু এদিক-ওদিক হলেই, ব্যস, বিপদ অনিবার্য। কখন গোল ছেড়ে বেরোতে হবে, দাসায়েভ খুব ভাল করে জানেন। অ্যান্টিসিপেশনের জবাব নেই। নিটোলভাবে বল গ্রিপ করতে পারেন অনায়াসে। যেন ব্যাপারটা কত সহজ। অখ্যাত দেশ ক্যামেরুন। কিন্তু তার গোলরক্ষকের কথা এখন নিশ্চয় পৃথিবীতে সবাই জানেন। তিনি এখন বিখ্যাত ব্যক্তি। দাসায়েভের সঙ্গে তাঁকে তুলনা করা যেতে পারে। কোনো অংশেই তিনি কম নন। এই দুই গোলকিপারের খেলা দেখে আমি মুগ্ধ হয়ে গেছি। কী অসম্ভব পরিশ্রম আর প্র্যাকটিস তাঁদের ওই পর্যায়ে তুলে নিয়ে গেছে, ভাবলে গায়ে কাঁটা দেয়। ইতালির অধিনায়ক দিনো জফের কথা আমি বাদ দিতে চাই না। তিনিও খুব উঁচুদরের গোলকিপার।

ইতালির রক্ষণভাগের খেলা দেখে আমার মন ভরে গেছে। এরকম ঠাসবুনটের রক্ষণভাগ বিশ্বকাপে আর কোনো দলের ছিল না। এমন-কী ব্রাজিল যে ব্রাজিল, তারও রক্ষণভাগ এমন জোরাল নয়। কী সব আত্মবিশ্বাসী খেলোয়াড়, বিপক্ষের বাঘা ফরোয়ার্ডদের কাছ থেকে অবলীলায় বল কেড়ে নিয়েছেন। বিপদের মুখে দাঁড়িয়েও মাথা ঠাণ্ডা রেখে খেলার অদ্ভুত ক্ষমতা তাঁদের। চমৎকার বোঝাপড়া নিজেদের মধ্যে। ইতালির ডিফেন্সকে এরকম মজবুত করে তোলার জন্য দলের কোচকে অবশ্যই ধন্যবাদ দিতে হবে। টেলি সান্তানাকেও অভিনন্দন না জানালে অন্যায় করা হবে। ডিফেন্সে ব্রাজিল-ইতালির ফারাক উনিশ-বিশের। নিতান্তই কপাল খারাপ বলব, নয়তো ব্রাজিল কি আর ইতালির কাছে হারার দল? তৃতীয় দল হিসেবে আমি কিন্তু ফ্রান্সকেই পছন্দ করছি।

মিডফিল্ডার আর ফরোয়ার্ডদের কথা আসছে এর পরে। আমি এখানেই ক্ষান্ত দিতে চাই। বাপ রে, কাকে ছেড়ে কাকে ধরব! জিকো, মারাদোনা, রোসি, প্লাতিনি, বনিয়েক, রুমেনিগে, সক্রেটিস, ফিশার, লাটো...। একসঙ্গে এঁদের কথা ভাবলেই আমার মাথা ঘুরে যায়। আচ্ছা, তোমায় যদি কোন রাজার ভাণ্ডারে চোখ বেঁধে ঢুকিয়ে, তারপর একরাশ মণিমুক্তোর সামনে গিয়ে বাঁধন খুলে দেওয়া হয়, তোমার কেমন লাগবে? চোখ ঝলসে যাবে না? কিছু ঠিক মতো ঠাহরই করতে পারবে না। আমারও সেই অবস্থা হয়েছে। আলাদা করে কারও সম্পর্কে কিছু বলতে পারব না।

একটা দুঃখের কথা বলছি। এ দুঃখটা হয়তো তোমাদেরও। আমি ব্রাজিলের সমর্থক। ব্রাজিল ফাইনালে যেতে পারেনি বলে আমার মনে যে কী কষ্ট হয়েছে, লিখে বোঝাতে পারব না।

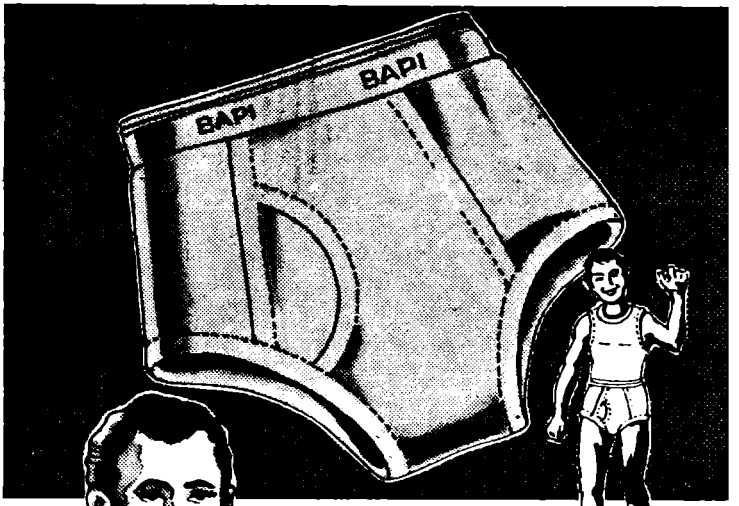

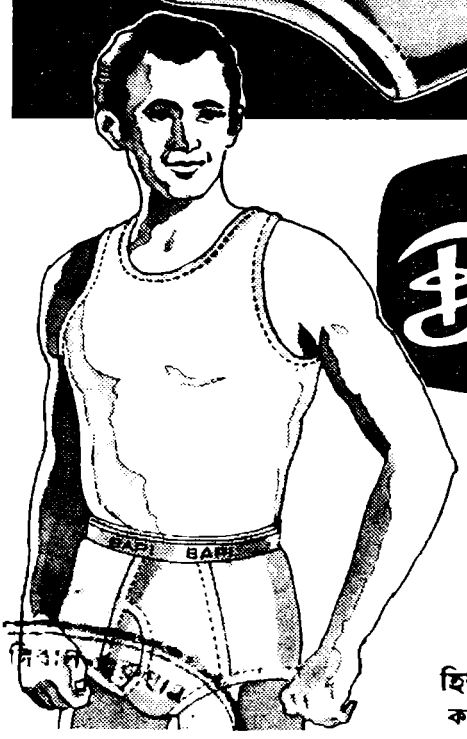

BAPI
BAPI
BAPI
Bapi
REGD.
বাপি
বাপি স্টার
গেঞ্জি • জাঙ্গিয়া
মোজা • শার্ট
হিন্দুস্থান টেক্সটাইল
কলিকাতা-৭০০ ০০৫
PRASA/HT-4/82

রুক্মিণী-অঞ্জনা

এবার মধ্যশিক্ষা পর্ষদের মাধ্যমিক পরীক্ষায় মেয়েদের মধ্যে প্রথম হয়েছে গোখলে. মেমোরিয়াল গার্লস স্কুলের রুক্মিণী মিত্র আর শ্রীরামপুর গার্লস হাইস্কুলের অঞ্জনা সেন। সব মিলিয়ে ওরা তৃতীয়। দুজনেই পেয়েছে ৭৯৫।

প্রথমে রুক্মিণীর কথা বলি। মতিলাল নেহরু রোডে রুক্মিণীদের বাড়ি। বাবা অসীমকুমার মিত্র একটি বেসরকারি সংস্থার অফিসার ছিলেন, এখন অবসরপ্রাপ্ত। দুই মেয়ে। বড় রাধারানী যাদবপুর থেকে ইংরেজি অনার্স নিয়ে এবার ফাইনাল পরীক্ষা দেবে। ফোনে বলাই ছিল কবে যাব। যেদিন ওদের বাড়িতে গেলুম তার আগের দিন রাত্তিরে বিশ্বকাপ সেমিফাইনাল হয়ে গেছে। বাড়ির সবাই প্রায় সারারাত ধরে টিভিতে ফ্রানস আর পশ্চিম জার্মানির খেলা দেখেছে। ছিমছাম ড্রয়িংরুম। টেবিলে আমার মুখোমুখি বসল রুক্মিণী। খুবই ছেলেমানুষ। সোফায় ওর বাবা এবং মা।

আমার প্রথম প্রশ্নটি ছিল এই রকম রেজাল্ট করবে সেটা কি তুমি আশা করেছিলে ? জবাবে বলল, "না, এতটা ভাল হবে আশা করিনি।" মা-বাবাও এই কথায় সায় দিলেন। তবে স্কুলের, বিশেষত হেডমিস্ট্রেস মাধুরী চৌধুরীর অনেক আশা ছিল তার উপর। রুক্মিণী গোখলের ছাত্রী কে জি টু থেকে। স্কুলে কখনো দ্বিতীয় হয়নি। স্কুলের কাজ বরাবর মন দিয়ে করেছে। অঙ্ক আর ফিজিক্যাল সায়েন্সে প্রাইভেট টিউটর ছিল। ফাইনাল পরীক্ষার আগের আট মাস স্থানীয় একটি টিউটোরিয়ালে পড়েছিল। জিজ্ঞেস করলুম,

রুক্মিণী মিত্র ফোটো তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

"তুমি কী ভাবে পড়াশোনা তৈরি করেছিলে ?" রুক্মিণী বলল, ওর ফার্স্ট ল্যাঙ্গোয়েজ ছিল বাংলা। বাকিগুলি ইংলিশ মিডিয়ামে। বাংলায় টেক্সট বই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়েছে। নোটবইও পড়েছে বিভূতি চৌধুরীর। বাংলায় চলতি ভাষা ব্যবহার করত। অঙ্কের মতো মুখস্থ করা ওর মোটেই পছন্দ নয়। তবে হ্যাঁ, প্রয়োজন মতো মুখস্থ করার সে পক্ষপাতী। বাংলা ব্যাকরণে বিভূতি চৌধুরীর 'বিচিত্রা' আর অমরনাথ ঘোষ ও দ্বিজমোহন সরকারের 'ভাষা ও প্রবন্ধ বিচিত্রা' পড়েছে। ইংরেজিতে রেন-মার্টিনের গ্রামার। সহজ সরল ইংরেজি লেখাতে ওর ঝোঁক। বাংলায় উল্টো। রুক্মিণী ইংরেজিতে ভাল। কিন্তু ওর আক্ষেপ লেটার পেল না বলে। সবচেয়ে প্রিয় সাবজেক্ট অঙ্ক। পেয়েছে ৯৯। অ্যাডিশন্যাল ম্যাথস্-এ ৯৮। এই প্রসঙ্গে কে· সি· নাগ ও কে· পি· বসুর বইয়ের কথা বলল। তাছাড়া হল অ্যান্ড স্টিভেন্সের জিওমেট্রির কথা। রুক্মিণী ক্রমাগত টেস্টপেপার সল্‌ভ করেছে। কিন্তু ইতিহাস ও ভূগোলের ব্যাপারে টেস্টপেপারকে গুরুত্ব দেয়নি। বাসু মিত্রের 'গ্লিম্পসেস অব ইণ্ডিয়ান হিস্ট্রি', কুন্দ্রার 'ইণ্ডিয়ান হিস্ট্রি' পড়েছে। স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্যে নিমাইসাধন বসুর 'দি

অঞ্জনা সেন

ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল মুভমেন্ট অ্যান্ আউটলাইন'। ভূগোলের জন্য পড়ত তরুণবিকাশ লাহিড়ী ও অমরনাথ সেনগুপ্তের 'ভারত ও বসুধা'। স্কুলে পাঠ্য ছিল এস· আর· চ্যাটার্জির বই। তাছাড়া মানচিত্রে ভূগোল থেকে প্রশ্নোত্তর তৈরি করেছে। ফিজিক্যাল সায়েন্সে ডেভিডসন সরকারের 'মডার্ন ফিজিক্যাল সায়েন্স', এস· পি· ব্যানার্জির 'এলিমেন্টস্ অব ফিজিক্যাল সায়েন্স'। লাইফ সায়েন্সের জন্য পড়েছে চণ্ডীচরণ দে-র 'লিভিং সায়েন্স ইন এভরি ডে লাইফ'। দাস-মুখার্জির বই। বোটানির পার্টটা এ· সি· দত্তের বই থেকে।

স্কুলের কথায় রুক্মিণী পঞ্চমুখ। শুধু লেখাপড়াতেই নয়, বিতর্কে, আবৃত্তিতে, নাটকেও সে অনেক পুরস্কার পেয়েছে। রুক্মিণী যে ভাল ইংরেজি লেখে তার নমুনা পেলুম ওর স্কুল ম্যাগাজিনে। কোনান ডয়েলের চেয়ে আগাথা ক্রিস্টি কেন তার কাছে প্রিয় এই নিয়ে প্রবন্ধ লিখেছে। ইংরেজিতে লেখা এই প্রবন্ধটি আমাকে মুগ্ধ করল। ক্লাস এইটে পড়ার সময় এটি লেখা। নিজের স্কুলেই সায়েন্স নিয়ে একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি হয়েছে। স্ট্যাটিস্টিক্স নিয়েছে। রুক্মিণী মোহনবাগানের সাপোর্টার। রবীন্দ্রনাথ, পরশুরাম আর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা ওর প্রিয়।

শ্রীরামপুর গার্লস হাইস্কুলে যখন ফোন করলুম, তখন সেখানে অঞ্জনার অভিনন্দন-অনুষ্ঠান চলছিল। হেডমিস্ট্রেস কল্পনা চক্রবর্তীর কাছে অঞ্জনার ঠিকানা পেলুম।

বিকেলবেলায় শ্রীরামপুর স্টেশনে নেমে একটা রিকশা নিলুম। অঞ্জনার বাবা হিমাংশুশেখর সেন ইণ্ডিয়ান কেব্‌ল্ কোম্পানি লিমিটেডে চাকরি করেন। জি টি রোডের উপরেই তাঁর ছোট্ট বাড়ি। একতলায় ডিসপেন্সারি। অবসরে হোমিওপ্যাথির ডাক্তারি করেন।

অঞ্জনারাও দু'বোন। দিদি অজন্তা ঐ একই স্কুল থেকে এবারে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছে। অঞ্জনাকেও রুক্মিণীর মতন ছেলেমানুষ মনে হয়। ও বাংলা মিডিয়ামে পড়াশোনা করেছে। এই সাফল্য ওর কাছেও অভাবিত। এই স্কুলে ক্লাস ওয়ান থেকে পড়ছে। টু থেকে বরাবর ফার্স্ট। স্কুলের কথায় অঞ্জনাও পঞ্চমুখ। ওর সবচেয়ে প্রিয় সাবজেক্ট ফিজিক্যাল সায়েন্স। এতে পেয়েছে ৯৪। অঙ্কে ৯৫। কম্বিনেশনে অ্যাডিশন্যাল সংস্কৃত কেন? উত্তরে অঞ্জনা বলল, ছোটবেলা থেকেই সংস্কৃত ওর ভাল লাগে। তিনজন প্রাইভেট টিউটর, স্কুলের দিদিমণিরা আর বাড়িতে দিদি ওকে খুবই সাহায্য করেছে। স্কুলে প্রত্যেক দিনের পড়া নিয়মিত তৈরি করত। টেস্টপেপার সল্‌ভ করত। গৃহশিক্ষকের টাস্ক করত। টেস্টের পরে লেখার জন্য অতিরিক্ত সময় ব্যয় করেছিল। না, কোনোদিন ঘড়ি ধরে পড়েনি। মুখস্থকে প্রাধান্য দিয়েছে। হিমাংশুবাবু কন্যার স্মৃতিশক্তির প্রশংসা করলেন। পাশের বাড়ির রেডিও থেকে ভেসে আসছিল মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল খেলার ধারাবিবরণী। অঞ্জনা বলল, "আমি কিন্তু

মোহনবাগান।" জিজ্ঞেস করলুম, "কী ভাবে তুমি পরীক্ষার জন্য তৈরি হয়েছিলে?" অঞ্জনা বলল, "বাংলা দিয়েই শুরু করছি। বাংলায় টেক্সট বই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়তুম। আমাদের হেডমিস্ট্রেস বলে দিয়েছিলেন, যদি লাইন তুলে প্রশ্ন আসে তাহলে মুশকিলে পড়ব না। প্রয়োজনে এম সেনের নোট পড়তুম। ব্যাকরণে বিভূতি চৌধুরীর 'বিচিত্রা'। সাধু গদ্যে বাংলা লিখি। ইংরেজিতে পি· কে· দে সরকার এবং পি মাহাতোর বই পড়েছি। ফিজিক্যাল সায়েন্সে অজয়কুমার চক্রবর্তীর 'মাধ্যমিক পদার্থ বিজ্ঞান ও রসায়ন'। লাইফ সায়েন্সে অমূল্যভূষণ চক্রবর্তীর 'জীবন বিজ্ঞান পরিচয়'। এছাড়া 'সেভেন টীচার্স' ও 'টেন এগ্‌জামিনার্স' পড়েছি। অঙ্কে মূলত কে· সি· নাগের বই। ইতিহাসে কিরণ চৌধুরীর বই। ভূগোলে লোকেশ চক্রবর্তীর বই ছাড়া উপেন্দ্রনাথ রায় ও সুরেন্দ্রকুমার চক্রবর্তীর 'ভারত ও ভূমণ্ডল'।"

এবার অঞ্জনাকে জিজ্ঞেস করলুম, "ভবিষ্যতে কী লক্ষ্য তোমার?" অঞ্জনা বলল, "ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার হতে চাই না। ফিজিক্সে রিসার্চ করার ইচ্ছে আছে।"

অঞ্জনা নিজের স্কুলেই সায়েন্স নিয়ে একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি হয়েছে। খুব ভাল ছবি আঁকতে পারে। অনেক প্রাইজ পেয়েছে। আর লেখে গল্প। চুপিচুপি দুটো উপন্যাসও লিখেছে। পাক্ষিক আনন্দমেলা ওর প্রিয় পত্রিকা। সবচেয়ে প্রিয় লেখক সত্যজিৎ রায়। তাছাড়া শংকর ও সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের লেখাও ভাল লাগে।

উঠে আসার সময় দেখতে পেলুম ঘরে চৌকির উপর একগাদা বই। অঞ্জনা বলল, "আজ স্কুল থেকে এই বইগুলো আমাকে প্রেজেন্ট করেছে। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনাবলীর ভেতরে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতার বইও রয়েছে।"

বাণীব্রত চক্রবর্তী

পঞ্চকন্যা

প্রমোদ বসু

একটি মেয়ের গানের গলায়
আর এক মেয়ে কাঁদে,
তার কান্নার সুরে সুরে
তিন নম্বর রাঁধে।
সেই রান্নার গন্ধ শুঁকে
চতুর্থটি হাঁচে,
হাঁচির শব্দে চমকে গিয়ে
ভয়ে পঞ্চম নাচে।
যেমনি নাচের বোল উঠেছে
বাজনদারের হাতে
বাইরে লোকে ভিড় করেছে
বারান্দা আর ছাতে।

ছবি: অহিভূষণ মালিক

পূর্ণেন্দু পত্রী
এবং
কলকাতা কাহিনী

কলকাতা নিয়ে ছোটদের জন্য যে-তিনখানি বই লিখেছেন পূর্ণেন্দু পত্রী তা শুধু ছোটরাই নয়, বড়রাও কাড়াকাড়ি করে পড়বেন। পড়বেন কেন, পড়ছেনই তো। একটা করে বই বেরোয়, আর চোখের পলকে মুদ্রণ শেষ। ফুরোবে না কেন, যেমন লেখা, তেমনই ছবি, তেমনই বিষয়। 'কী করে কলকাতা হলো'তে পূর্ণেন্দু পত্রী শুনিয়েছেন কলকাতা শহরের পত্তন থেকে শুরু করে বাড়বাড়ন্তের কাহিনী। 'ছড়ায় মোড়া কলকাতা'য় তিনি শুনিয়েছেন কলকাতা নিয়ে চলতি সব ছড়ার নেপথ্য ইতিহাস। আর 'কলকাতার রাজকাহিনী' হল ফেলে-আসা কলকাতার পাঁচ রাজা ও এক রাজকুমারের গল্পের মতো জীবনকাহিনী। পূর্ণেন্দু পত্রীর কলমে ইতিহাসের বাসী গল্প হয়ে ওঠে ফুলের মতো তাজা। প্রত্যেকটি বইতেই ঐতিহাসিক ও দুষ্প্রাপ্য বিস্তর ছবি।

পূর্ণেন্দু পত্রীর বই

কী করে কলকাতা হলো ৫·০০
ছড়ায় মোড়া কলকাতা ৫·০০
কলকাতার রাজকাহিনী ৫·০০

আরো অনেক বই

কুম্ভক-এর শব্দ নিয়ে খেলা ১০·০০ সংকর্ষণ রায়ের গভীর গহন ৭·০০ ননীগোপাল চক্রবর্তীর [illegible] ৬·০০ যাদুঘরে চলো যাই ৬·০০ পীর ফকিরের আস্তানায় ৬·০০ গিরিধারী কুণ্ডুর টংসা চু ৬·০০ রাত একলা ৪·০০ সুবোধ ঘোষের সেই অদ্ভুত অভ্রখানি ৬·০০

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন কলকাতা ৯ ফোন ৩৪ ৪৩৬২

শ্রীকৃষ্ণ গ্রন্থাগার

রাজার শিকার

এক ছিলেন রাজা। নাম তাঁর হীরক। তিনি ছিলেন খুব বীর। তাঁর এক রানী ছিল। আর ছিল ফুটফুটে সুন্দর এক যুবরাজ।

একদিন রাজা ঠিক করলেন যে, বনে যাবেন শিকার করতে। রানী বললেন সিপাই নিয়ে যেতে। রাজা বললেন, "আমি কোনো লোকজন সঙ্গে নেব না।"

রাজা তো গেলেন শিকারে। একদিন হয়ে গেল, দু'দিন হয়ে গেল, কিন্তু রাজার আর দেখা নেই। রানী তখন লোকজন পাঠিয়ে দিলেন রাজার খোঁজে। তারা চারদিকে রাজার খোঁজ করতে লাগল।

কিছু দূর গিয়ে এক দল দেখতে পেল, রাজার পাগড়ি একটি গাছের নীচে পড়ে আছে। একটু এগিয়ে গিয়ে দেখল রাজা অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছেন মাটিতে। তারা রাজাকে নিয়ে ফিরে এল। বৈদ্য ডাকা হল। রাজার জ্ঞান ফিরল। জিজ্ঞেস করার পর রাজা বললেন, "আমি ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছি। হঠাৎ কে যেন আমার মাথায় ডাণ্ডা মারল। তারপর আর কিছু জানি না।"

অপর্ণা রায়চৌধুরী (বয়স ৮)

শাসন করার সময়

আমাদের একটা কুকুর আছে। এখন অনেকের বাড়িতে যেমন মস্ত নেকড়ের মতো অ্যালসেশিয়ান দেখা যায়, এ-কুকুর ঠিক তেমন কুকুর নয়। দেখতে তো নয়ই। কিন্তু ওর মতোএত বুদ্ধিমান আর সজাগ কুকুর আমি খুব কমই দেখেছি।

বাড়িতে কেউ এলে ঘেউ-ঘেউ করে বাড়ির লোককে জানান দেবে, তারপর তার পা শুঁকে পরীক্ষা করে নিশ্চিন্ত হবে।

এই কুকুর পুষে আমরা দিব্যি নিশ্চিন্ত, কিন্তু ওকে নিয়ে বিপদও কম নয়। আমার দিদি একদিন মাস্টারমশাইয়ের কাছে পড়তে বসেছে। মাস্টারমশাই যতক্ষণ থাকেন, ততক্ষণ ও দিদির পাশেই বসে থাকে। সেদিন পড়তে পড়তে দিদি বোধ হয় দুষ্টুমি করছিল। মাস্টারমশাই তাই ওকে চড় মারার জন্য যেই হাত তুলেছেন অমনি কুকুরটা মাস্টারমশাইয়ের হাত কামড়ে ধরল।

মাস্টারমশাই তখন ভয়ে-ভয়ে উঠে এসে মাকে বললেন, "এমন কুকুর পুষেছেন যে, দেখছি আপনার মেয়েকে একটু-আধটু শাসনও করা যাবে না।"

মধুশ্রী চক্রবর্তী (বয়স ১২)

রমেশবাবু ভদ্রলোক

রমেশবাবু ভদ্রলোক
ব্যবসা রাজধানীতে,
সিন্দুকেতে টাকা অনেক
থাকেন অজ গাঁয়েতে।
কিসের যে তিনি ব্যবসা করেন
কারোর যে তা জানা নাই,
সব শিশুদের তিনি কিন্তু
ভালবাসেন সর্বদাই।

আন্দোলন মণ্ডল (বয়স ১৩)

বাদুড় ধরা

একবার গরমের ছুটিতে মামারবাড়ি গিয়েছিলাম। আমার মামারবাড়ির কাছেই গঙ্গা নদী। আমি সেখান থেকে স্নান করে এসে দেখি মাঠে কয়েকটি লোক বসে আছে। তাদের দেখে তো আমরা সবাই ছুটে গেলাম। গিয়ে দেখি এরা বাদুড় ধরতে এসেছে।

কেমন করে বাদুড় ধরে সেটা দেখতে পাব বলে ভারী মজা হল। ওদের একটা লোকের হাতে ছিল একটা লম্বা বাঁশ, তার ডগায় জাল লাগানো। গাছের কোথায় বাদুড় থাকে ওরা জানে। ওরা তার নীচে জাল-লাগানো বাঁশটাকে ধরল, বাদুড়গুলো সব জালের মধ্যে আটকা পড়ল।

এর পরে লোকগুলো আর এক জায়গায় গেল বাদুড় ধরতে। এবার দুটো মোটে ধরা পড়ল, বাকি সব উড়ে গেল। মনে হয়, ওরা বুঝতে পেরেছিল ওদের ধরতে এসেছে।

নীপমঞ্জরী বর্মণ (বয়স ৭)

হবি

বাবার হবি আকাশ দেখা
অফিস থেকে এসে
দাদার হবি উত্তর দেখা
বইয়ের পাতার শেষে
মায়ের হবি নভেল পড়া
দুপুরবেলা হলে
যতই ঘুমোক আর সকলে
পর্দা দেবেন খুলে
জ্যেঠুর হবি গান গাওয়া আর
শোনানো সেতার
দিদির হবি তৈরি করা
কাঁচা আমের আচার

মৌসুমী পাল (বয়স ১১)

ছবি এঁকেছে রঞ্জিনী সিন্‌হা (বয়স ১১)

নির্মল শ্বাস-প্রশ্বাস...
সুস্থ সবল দাঁত

কোলগেট
ডেন্টাল ক্রীমের গুণে

প্রতিবার খাওয়ার পরেই কোলগেট দিয়ে দাঁত মাজুন। আপনার দাঁতকে সুরক্ষিত রাখার জন্যে সারা পৃথিবীতে দাঁতের ডাক্তাররা এই উপদেশই দেন।

দাঁতের ফাঁকে খাবারের টুকরো থেকে গেলে রোগ-জীবাণুর সৃষ্টি হয়। ফলে নিঃশ্বাসে দুর্গন্ধ আসে, পরে দাঁতে যন্ত্রনাদায়ক ক্ষয়রোগের শুরু হয়ে যায়।

সুতরাং প্রতিবার খাওয়ার পরেই কোলগেট দিয়ে দাঁত মাজুন। দাঁতকে সাদা ঝকঝকে করে তুলে নিঃশ্বাসের দুর্গন্ধ ও দাঁতের ক্ষয় রোধে কোলগেটের অসাধারণ ক্ষমতা বহুবার প্রমাণিত হয়ে গেছে।

কোলগেটে এমন এক চমৎকার তাজা মিন্টি স্বাদ রয়েছে যে অনেকক্ষণ ধরে দাঁত ব্রাশ করতে ইচ্ছা করবেই।

কোলগেটের নির্ভরযোগ্য ফরমূলা কি ভাবে কাজ করে!

নিঃশ্বাসের দুর্গন্ধ ও দাঁতের ক্ষয়রোগের জীবাণু জন্ম নেয় দাঁতের ফাঁকে আটকে থাকা খাবারের টুকরো থেকে।

কোলগেটের প্রচুর ফেনা দাঁতের ফাঁকে ঢুকে অবাঞ্ছিত খাবারের টুকরো ও রোগ জীবাণু দুইই দূর করে।

ফলাফলঃ সাদা ঝকঝকে দাঁত, নির্মল তাজা শ্বাস-প্রশ্বাস ও দন্তক্ষয় রোগ প্রতিরোধের দৃঢ় মনোবল।

কোলগেট ডেন্টাল ক্রীম দিয়ে নিঃশ্বাসের দুর্গন্ধ দূর করুন... দাঁতের ক্ষয় রোধ করুন!

DC.G.74 BN

জীবন ও হনু

ঘোড়ার বুদ্ধি দেখে অবাক

বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে জার্মানীতে 'ক্লেভর হন্স' নামে একটি ঘোড়া ছিল। সে পড়তে, গণিতের সমাধান করতে এবং বিশ্ব রাজনীতির প্রশ্নের উত্তর দিতে পারত।

গণিত সম্পর্কে কোন প্রশ্ন করলে (যেমন ৩ আর ৪-এ কত হয়) হন্স পা ঠুকে তার জবাব দিত (এ ক্ষেত্রে ৭ বার)।

গণিত ছাড়া অন্য বিষয়ের প্রশ্নের ক্ষেত্রে (যেমন লণ্ডন কি বৃটেনের রাজধানী?) সে মাথা ঝুঁকিয়ে কিম্বা নেড়ে জবাব দিত। এমন কি ব্ল্যাকবোর্ডে লেখা প্রশ্নের উত্তরও সে দিত। শেষ পর্যন্ত হন্সের উত্তর দেবার এই রহস্যের সমাধান করা গেল। সে সব সময়

আশেপাশের লোকদের, বিশেষ করে ওর প্রভু অস্টেনের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করত। যখন ওকে কোন গণিতের প্রশ্ন করা হ'ত, লোকে হন্সের পায়ের তারিফ করত...সঙ্গে সঙ্গে সে পা ঠোকা শুরু করত। যখন সঠিকবার পা ঠোকা হয়েছে, তখন দর্শকদের মধ্যে কোন না কোন প্রতিক্রিয়া দেখা দিত। অনেক সময় তাঁদের অনিচ্ছাতেও তা স্বাভাবিক ভাবে প্রকাশ পেত। তাদের মধ্যে কেউ বা ঘাড় নাড়তেন, কেউ বা আনন্দসূচক ভাব প্রকাশ করতেন, কে'হ হাস'তেন। সঙ্গে সঙ্গে হন্সের পা ঠোকা থেমে যেত।

গণিত ছাড়া অন্য বিষয়ের প্রশ্নের ব্যাপারেও সে কোন না কোন ইঙ্গিত পেয়ে যেত। কী করে কোথা থেকে সে এসব শিখল,কেউ জানতো না। সবচেয়ে মজার কথা হচ্ছে এই যে ঘোড়ার উত্তর জানার পদ্ধতি সম্বন্ধে সচেতন হওয়ার জন্য, ইঙ্গিত প্রকাশ না করার হাজার চেষ্টা করেও, লোকেরা অজ্ঞাতসারেই ঘোড়াকে ইঙ্গিত যোগাত।

জীবন বীমা হ'ল আপনার পরিবারের সুরক্ষার সবচেয়ে নিশ্চিন্ত ও নিরাপদ উপায়। এ সম্পর্কে বিশদ জেনে নিন।

ভারতীয়
জীবন বীমা নিগম